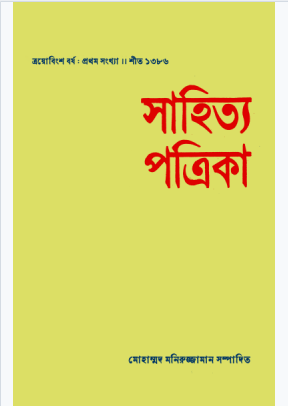

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজচিন্তা

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিদ্দিকুর রহমান
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.6
Pages	88-127
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজচিন্তা

সিদ্দিকুর রহমান

প্রথম অধ্যায়

প্যারীচাঁদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পরিবারসমূহের অন্যতম এক পরিবারে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)-এর জন্ম। তাঁদের আদি-নিবাস হুগলী জেলার হরিপাল থানার পানিসেওলা গ্রামে। তাঁর পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার নিমতলাঘাট স্ট্রীটে এসে বসবাস শুরু করেন।[১] তিনি রামদুলাল সরকারের কারবারের একজন অংশীদার ছিলেন। তিনি 'হাটখোলার ধনকুবের মদনমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ' করেন।

গঙ্গাধর মিত্রের তিন পুত্র—রামনারায়ণ, নিমাইচরণ ও নন্দলাল। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ ছিলেন কিছুটা 'পাশ্চাত্যভাবাপন্ন'। তিনি 'কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায়ে'র দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে একটি জমিদারীও ক্রয় করেছিলেন। রাজা রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তিনি রাধামোহন সেনের সঙ্গে যৌথ চেষ্টায় "সঙ্গীত-তরঙ্গ" নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি সেকালের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।[২]

রামনারায়ণ কোন্নগর নিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। আনন্দময়ী অত্যন্ত কোমলপ্রাণা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। সেকালে যদিও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হয়নি তবুও আনন্দময়ী বাংলাভাষায় যথেষ্টশিক্ষিতা ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকায় লিখেছেন, যখন তিনি পাঠশালায় প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেন সেই সময় তিনি তাঁর পিতামহী, মাতাঠাকুরাণী ও জেঠাইমাদেরকে বাংলা পুস্তকাদি পাঠ করতে দেখেছেন।[৩]

রামনারায়ণের পাঁচ পুত্র—মধুসূদন, শ্যামচাঁদ, নবীনচাঁদ, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ। শ্যামচাঁদ ষোল বছর বয়সেই মারা যায়। মধুসূদন ও নবীনচাঁদ জমিদারী সংক্রান্ত কর্মে

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ২১, ২য় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬২), পৃ. ১৭৫

২ দীনেশচন্দ্র সেন, 'প্যারীচাঁদ মিত্র,' "প্রদীপ", ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা (চৈত্র, ১৩০৭), পৃ. ১২১

৩ দ্রষ্টব্য : 'আধ্যাত্মিকার ভূমিকা', "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা

নিযুক্ত হন।[৪] চতুর্থ প্যারীচাঁদ ও কনিষ্ঠ কিশোরীচাঁদ আজীবন সাহিত্য ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। রামনারায়ণ ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর (১১ই কার্তিক, ১২৪৯) মারা যান।[৫]

প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুলাই (১২২১ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে রাজভাষা ছিল ফার্সী। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ফার্সী উঠে গিয়ে ইংরেজী রাজভাষা হিসেবে চালু হয়। কাজেই সে সময়ে সকলকেই ফার্সী শিখতে হত। প্যারীচাঁদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মধুসূদনের মত প্যারীচাঁদও শৈশবে মুন্সীর নিকট ফার্সী এবং গুরুমশায়ের নিকট বাংলা শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে সমস্ত ফার্সী শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় তার বীজ উপ্ত হয়েছিল এই সময়েই। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

ইংরেজী এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হওয়ার জন্য প্যারীচাঁদ ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই হিন্দু কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স তেরো বৎসর। প্রথমতঃ উচ্চারণ দোষ ও গ্রাম্যতার জন্য তাঁকে সহপাঠিদের কাছে বড়ই লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর প্রতিভা, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও আশ্চর্য মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কারণে হিন্দু কলেজের গণিতের শিক্ষক অধ্যাপক টাইটলার সাহেব তাঁকে 'দার্শনিক' বলে সম্বোধন করতেন। এই সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন পিটার গ্রান্ট একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সহপাঠী দিগম্বর মিত্র ও অন্যান্য প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে পরাজিত করে এই পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ১৬ (ষোল) টাকা বৃত্তি লাভ করেন।[৬] তৎকালে এই বৃত্তিলাভ অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় বলে বিবেচিত হত।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই প্যারীচাঁদ অন্যতম তরুণ বিপ্লবী শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্যগ্রহণ করেন ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে।[৭] তিনি হিন্দু কলেজে মাত্র পাঁচ বছর (মে, ১৮২৬—এপ্রিল, ১৮৩১) শিক্ষকতা করেন। কিন্তু এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর আদর্শ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে সমর্থ হন। ক্লাসের গতানুগতিক শিক্ষাদানেই তিনি তৃপ্ত হতেন না, সকল ছাত্রের মধ্যে যাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটানো যায় তার জন্যে স্বীয় ভবনে ছাত্রদের এনে জড়ো করতেন। হিন্দু কলেজের উদীয়মান এই তরুণছাত্রদের নিয়েই তিনি গঠন করেছিলেন 'অ্যাকা-ডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (Academic Association)। বলা বাহুল্য যে, এই অ্যাসো-

---

৪ মন্মথনাথ ঘোষ, "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র" (কলিকাতা : আদিব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রালয়, ১৩৩৩), পৃ. ১১-১২

৫ ঐ, পৃ. ৪৮

৬ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "প্রদীপ", পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৭ 'সমাচার দর্পণ', ১৩ই মে, ১৮২৬ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং. কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৫৬), পৃ. ৩২

সিয়েশনের উদ্দেশ্য সর্বাংশেই 'Academic' ছিল না।[৮] নৈতিক ও সামাজিক বিবিধ বিষয় এখানে স্বাধীন ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হত। এই 'অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয় ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে। ডিরোজিও প্রথম থেকেই এই সভার সভাপতি ছিলেন; উমাচরণ বসু ছিলেন সম্পাদক।[৯] ডেভিড হেয়ার, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, ডক্টর মিল প্রভৃতি সেকালের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও এই আলোচনা সভায় যোগ দিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রতিষ্ঠাবধিই এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ডিরোজিওর প্রভাব হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ স্থায়ী আসন লাভ করেছিল, প্যারীচাঁদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু রাধানাথ সিকদারের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হবে। স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "ডিরোজিও ছিলেন দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক। সর্বপ্রথম তিনি আমাদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। পাপের প্রতি ঘৃণা ও সত্যানুসন্ধিৎসা—যে দু'টি গুণ এখনকার শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে দেখা যায়—যা' ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ, এসব কিছুর মূলে ছিলেন ডিরোজিও"।[১০] প্যারীচাঁদ মিত্রও 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' গ্রন্থে ডিরোজিও প্রসঙ্গে লিখেছেন, "হিন্দু কলেজে যত শিক্ষক ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে ডিরোজিও কৌশলক্রমে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতেন, এজন্য কতিপয় শিষ্য অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকটে যাইত।"[১১]

এই তরুণ শিক্ষকের প্রভাব প্যারীচাঁদের মানস-ভূমি গঠনে ছিল অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই (১৮৩০ খ্রী.) প্যারীচাঁদ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্তে তাঁর নিমতলাঘাট স্ট্রীট সংলগ্ন বাড়ীতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন। তাঁর এ নবনির্মিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও মাঝে মাঝে এসে উৎসাহ দান করতেন এবং মেধানুযায়ী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করতেন। এ তথ্য পরিবেশন করেছেন প্যারীচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র।[১২] এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে শিক্ষা দেওয়া হত। শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ সিকদার, কালাচাঁদ শেঠ, রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ ছিলেন অবৈতনিক সহকারী শিক্ষক এবং প্যারীচাঁদ ছিলেন প্রধান শিক্ষক। প্যারীচাঁদের মন ছাত্রাবস্থাতেই কিভাবে সমাজসচেতন হয়ে উঠেছিল, এই অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরপরে আরম্ভ হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের কর্মজীবন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে মার্চ 'দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ এর 'সাব-লাইব্রেরীয়ান' পদে নিযুক্ত হন। তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগদান করে অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠা সহকারে কাজ চালিয়ে যান। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় লাইব্রেরীর সর্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে মেকটাফ হলের দোতালায় লাইব্রেরী

---

৮ ভূদেব চৌধুরী, "বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা", দ্বিতীয় পর্যায় (চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮০), পৃ. ৭৮

৯ যোগেশচন্দ্র বাগল, "ডিরোজিও" (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৮২), পৃ. ৬৪-৬৫

১০ 'রাধানাথ সিকদার' "আর্য্যদর্শন", দশম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা (কার্তিক, ১২৯১), পৃ. ২৯৩

১১ প্যারীচাঁদ মিত্র, 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত', "প্যারীচাঁদ-রচনাবলী", মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত (ঢাকা: ১৩৭৫), পৃ. ৫১৫

১২ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা": ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

স্থানান্তরিত হয়। মেকটাফ হল নির্মাণে পাবলিক লাইব্রেরীকে ষোল হাজার চারশত টাকা ব্যয় বহন করতে হয়েছিল। সে টাকা প্যারীচাঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হয়। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তাঁর সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে একশত টাকা বেতনে 'সেক্রেটারী' ও 'প্রধান লাইব্রেরীয়ানে'র পদে উন্নীত করেন। তিনি এই পদে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। তারপরেও অবশ্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি 'অবৈতনিক কিউরেটার' নিযুক্ত হন। এই সম্মানজনক পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৩] লাইব্রেরীতে চাকুরী নিয়ে প্যারীচাঁদ জ্ঞানানুশীলনে যথেষ্ট সুযোগ পান।

প্যারীচাঁদ ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণ' দ্বিভাষী-সাপ্তাহিক হিসাবে বের হয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় প্যারীচাঁদ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৪] ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইয়ংবেঙ্গল দলের অন্যতম প্রবক্তা রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক আর একখানি দ্বিভাষী-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়: "অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমারদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি।"[১৫] প্যারীচাঁদ—এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখতেন। অবশ্য সম্পাদকীয় ছাড়াও তিনি এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই একটি করে প্রবন্ধ লিখতেন।[১৬]

প্যারীচাঁদ তৎকালীন প্রায় প্রত্যেকটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। স্বগৃহে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজসচেতনতার প্রয়াস ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, এবারে দেখব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে তিনি কিভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে প্রমুখ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' (The Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মানসিক উন্নতি সাধনই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।[১৭] তারাচাঁদ চক্রবর্তী এর সভাপতি নিযুক্ত হন। যুগ্ম সম্পাদক হলেন প্যারীচাঁদ ও রামতনু লাহিড়ী। ডেভিড হেয়ার এই সভার অধিবেশনগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। প্রতি মাসের দ্বিতীয়

---

১৩ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৯

১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সাময়িক পত্র", প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং. কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৫৪), পৃ. ৩৯

১৫ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', ১ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৮৪২। উদ্ধৃত: বিনয় ঘোষ সম্পাদিত "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র", ৩য় খণ্ড (কলিকাতা, বীক্ষণ প্রকাশন ভবন, ১৯৬৪), পৃ. ৭৫

১৬ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" ; ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

১৭ Goutam Chattopadhyay (ed.), *Awakening in Bengal in early nineteenth Century*, Vol. one, (Cal : Progressive publishers, 1965) Preface, pp. LIV, LIV

সপ্তাহের বুধবার দিন এ সভার বৈঠক বসত।[১৮] প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভায় একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। যেমন, প্রথম প্রবন্ধ : States of Hindoostan Under the Hindoos ; (মোট পাচ কিস্তিতে সম্পূর্ণ) ; দ্বিতীয় প্রবন্ধ : A few desultory Remarks on the "Cursory Review of the Institutions of Hindooism affecting the interest of the Female Sex," Containd in the Rev. K. M. Benerjea's prize Essay on Native Female Education. (১২ই জানুয়ারী, ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনে পঠিত।)[১৯]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিহাস ও রাজনীতিই প্যারীচাঁদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। প্রথম প্রবন্ধ (States of the Hindoostan under the Hindoos)-ই তার প্রমাণ। তাছাড়াও, দেখা যায় যে তিনি ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের 'Calcutta Review' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় 'The Zamindar and the Ryot' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের পর বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি এই প্রবন্ধটি লর্ড এলবোমারল কর্তৃক পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস সভায় বিশেষরূপে উল্লিখিত হয়ে আলোচনার বিষয় হয়েছিল।[২০]

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাতের পার্লামেন্টের সদস্য মানবহিতৈষী জর্জ টমসন এর সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রজাদিগের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তদনুসারে সরকারকে অবহিত করানো এই সোসাইটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। "Evidence relating to the Efficiency of Native Agency in the Administration of the Affairs in this Country" নামক একখানি পুস্তিকাও প্যারীচাঁদের সহায়তায় এই সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[২১]

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের গঠিত 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' (জমিদার সভা) রামগোপাল ঘোষের প্রযত্নে সংমিলিত হয়। এই যুক্ত সভার নাম 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। রাধাকান্ত দেব এর সভাপতি এবং কালীকৃষ্ণ দেব সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে প্যারীচাঁদ কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সংকলিত 'Notes on the Evidence on Iadian Affairs' নামক পুস্তিকাখানি ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে এই সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[২২]

ভারতহিতৈষী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (বীঠন) সাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট। তাঁর অনুরাগী দেশীয় ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তৎকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্পাদক ডাঃ এফ. জে. মৌয়াট সাহেবের

---

১৮ Goutam Chattopadhyay (ed.), *Awakening in Bengal in early nineteenth Century*, Vol. one, (Cal : Progressive publishers. 1965) Preface pp. LVII, LIX, LX

১৯ *Ibid*, pp. 131, 157, 246, 314, 351, 273

২০ *London Times*, 5th July, 1853. উদ্ধৃত : দীনেশচন্দ্র সেন, 'প্যারীচাঁদ মিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

২১ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"; ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

২২ ঐ, পৃ. ১৮২

নেতৃত্বে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে মিলিত হয়ে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি আলোচনা সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এরই নাম বেথুন সোসাইটি (Bethune Society)। এখানে জাতীয় সমস্যা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হত।[২৩] প্যারীচাঁদ এই সোসাইটির 'অবৈতনিক সম্পাদক' ছিলেন। একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বছর এই সোসাইটি চলেছিল।

পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত বাঙালীর সুহৃদ ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয় ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন। সেই বছরই তাঁর স্মরণার্থে যে 'হেয়ার প্রাইজ কমিটি' গঠিত হয় প্যারীচাঁদ ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা।[২৪]

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারীচাঁদ ও তাঁর ছোটভাই কিশোরীচাঁদ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁদের স্বীয় ভবনে "হিন্দুবিশ্ব-প্রেমোদ্দীপনী সভা" (Hindu Theophilanthropic Society) নামক একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করা এবং ঈশ্বর-পরলোক, সত্য এবং সুখ সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৫] এই সভায় ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডর্ফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখেরা যোগদান করতেন। প্রতি মাসে সভার একটি করে অধিবেশন বসত এবং তাতে ইংরেজী অথবা বাংলাভাষায় ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ এবং নীতি ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত হত। এই সভা অধিককাল স্থায়ী হয়নি। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে এর অস্তিত্ব লোপ পায়।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর কাশীপুরের বাড়ীতে 'সমাজউন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতি' নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর সভাপতি। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ রোধ নারীজাতির শিক্ষাবিস্তার ও চড়ক পূজা সংক্রান্ত নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপসাধন এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্যারীচাঁদ প্রতিষ্ঠাবধি এই সভার কার্যনির্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা'য় সর্বপ্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।[২৬] সে আবেদনপত্রে প্যারীচাঁদ তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে লিখিত কিশোরীচাঁদের ডায়েরীতে সে কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। "আমি, দাদা, রাধানাথ, রসিক ও তারকনাথ সেন একত্র হইয়া হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বার বিবাহ সম্বন্ধে ব্যাবস্থাপক সভার প্রতি আমাদের প্রার্থনা পত্র বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম।"[২৭] এমন কি কলকাতায় প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সে অনুষ্ঠানে প্যারীচাঁদ উপস্থিত ছিলেন।[২৮]

---

২৩ যোগেশচন্দ্র বাগল, "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা" (কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৮), পৃ. ২১৮

২৪ "প্যারীচাঁদ-রচনাবলী", মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭১

২৫ "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮-৫০

২৬ ঐ, পৃ. ৯৯-১০০

২৭ ঐ, পৃ. ১০৭

২৮ ঐ, পৃ. ১০৯

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতহিতৈষীণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবে 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' (The Bengal Social Science Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ ও এইচ. বেফারলি এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'পশুক্লেশনিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ প্রথম থেকেই এর কার্যনির্বাহক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কোলস্ওয়ার্দী গ্রাণ্টের মৃত্যুর পর তিনি এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের 'ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য মনোনীত হন। এপদে তিনি দু'বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২৯] এই সময় তাঁরই যত্ন ও চেষ্টায় পশুক্লেশনিবারণ বিষয়ে দু'টি বিল (১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১ ও ৩ নং অ্যাক্ট) আইনসভায় উপস্থাপিত হয় এবং যথাসময়ে তা আইনে পরিণত হয়।[৩০]

বিভিন্ন সৎকর্ম ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে প্যারীচাঁদ যেমন অগ্রণী ভূমিকা নিতেন তেমনি বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্য ও কৃষিতত্ত্ব প্রচারেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। ডঃ উইলিয়ম কেরীর প্রচেষ্টায় ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠা হয়। প্যারীচাঁদ ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন। তখন থেকেই তিনি কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিবিদ্যার চর্চা শুরু করেন। দেশীয় লোকদের মধ্যে কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। সভার মুখপত্র 'Journal'এ সেগুলো প্রকাশিত হয়।[৩১] ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ প্যারীচাঁদের সহায়তায় 'Journal' ও 'Transactions' থেকে প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য একটি 'অনুবাদ সমিতি' গঠিত হয় এবং এই অনূদিত বিবিধ প্রবন্ধসমূহ 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' (The Agricultural Miscellany)-তে প্রকাশিত হ'তে থাকে। প্যারীচাঁদ ইহা সম্পাদনা করতেন। Journal প্রকাশিত প্রবন্ধের কয়েকটি তিনি স্বয়ং অনুবাদ করেন এবং 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহে' তা' স্থান পায়। এমন কি এইসব অনূদিত প্রবন্ধ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃষিপাঠ' গ্রন্থেও স্থান পায়। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি Agriculture in Bengal নামে আর একখানি কৃষিবিষয়ক পুস্তক লেখেন। এই সমস্ত গ্রন্থে তাঁর কৃষিবিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ছোটলাট স্যার সিসিল বীডনের যত্নে বেলভিডিয়ারে যে বিরাট কৃষিপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, প্যারীচাঁদ তার একজন বিচারক মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দশ বছর এই সোসাইটির সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন।[৩২]

এছাড়াও প্যারীচাঁদ 'স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি'র সদস্য ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত

---

২৯ শিবনাথ শাস্ত্রী, "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৪), পৃ. ১৩২

৩০ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ২, পূর্বোক্ত পৃ. ১৯০

৩১ যেমন, (১) Bengal Rice ; (২) Indian Wheat ; (৩) Agriculture in Bengal ; (৪) Department of Agriculture; (৫) Sugarcane; (৬) Cultivation of Flax ; (৭) Silk and Paper from the Mulberrybark; (৮) Madder Plant

৩২ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৫

হন। এই সমস্ত পদে বৃত থেকে তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি ডিস্ট্রীক্ট-চ্যারিটেবল সোসাইটিরও একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতার 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট' ও 'জাস্টিস অব দি পিসে'র সম্মান এবং হাই কোর্টের গ্রান্ট জুরির পদ লাভ করেছিলেন।

প্যারীচাঁদের স্ত্রী বামাকালীর মৃত্যু হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। এর পর থেকেই তিনি প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) ও ব্রহ্মজ্ঞানে (Theosophy) গভীর অনুরাগী হয়ে পড়েন। প্যারীচাঁদের দাম্পত্যজীবন আদর্শ স্থানীয় ছিল। তাঁর 'রামারঞ্জিকা', 'বামাতোষিণী' ইত্যাদি গ্রন্থে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র আছে সেখানে তিনি এক স্নিগ্ধমধুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর সহধর্মিণীই বোধ হয় পরোক্ষে এর প্রেরণা যুগিয়ে থাকবেন। যিনি একদা ছায়া ও কান্তি দিয়ে স্বামী-সেবা করেছেন তাঁরই মৃত্যুতে প্যারীচাঁদ বোধ হয় তাঁকে ছায়ারূপেও প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। "On the Soul" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, "In 1860, I lost my wife, which convulsed me much. I took to the study of Spiritualism which, I confess, I would not have thought to otherwise nor relished its charms."[৩৩]

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্ট' এবং ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ প্রথমটির অনারারি করেসপণ্ডিং মেম্বর এবং দ্বিতীয়টির অনারারি মেম্বর ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় 'ইউনাইটেড্ অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ এর সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি' গঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন কর্নেল ওলকট এবং অন্যতম প্রধান নেত্রী ছিলেন মাদাম ব্লাভাট্স্কি। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচাঁদ এই সভার করেসপণ্ডিং ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ওলকট-ব্লাভাটস্কি বোম্বাই শহরে এসে প্রথম থিয়সফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। প্যারীচাঁদ এই সোসাইটির মুখপত্র 'Theosophist'-এ 'The Inner God' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মার্চ ওলকট ও ব্লাভাটস্কি কলকাতায় আসেন। প্যারীচাঁদ তাঁদের সাহায্য করেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগ ও পরিশ্রমে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল কলকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির শাখা স্থাপিত হয়। প্যারীচাঁদ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন।[৩৪]

প্যারীচাঁদ শেষ বয়সে যোগসাধনা আরম্ভ করেন। যোগের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল গভীর এবং দৃঢ়। এমন কি 'The Spiritual Stray Leaves' নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন যে, বহু-সংখ্যক ভূতযোনির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেন ও তারা সর্বদা তাঁর ধর্ম বিশ্বাস সুদৃঢ় করে।[৩৫] তিনি জন্মান্তর মানতেন না।

---

৩৩ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৩৪ ঐ, পৃ. ১৮৭-১৮৯

৩৫ দীনেশচন্দ্র সেন, 'প্যারীচাঁদ মিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আত্মা এক অরূপ জগতে উপনীত হয় এবং সেখানে সে শোক-দুঃখাতীত চিরপ্রসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আত্মা সম্পর্কিত এই ইতিবাচক মনোভাব তাঁর শেষদিকের কয়েকটি রচনা যেমন, 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মূর্তিপূজক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদী এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সাধনার অন্যতম ফল 'মাসিক-পত্রিকা' সম্পাদনা। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট (১লা ভাদ্র, ১২৬১) রাধানাথ সিকদারের সহযোগিতায় তিনি স্ত্রীসমাজের মানসিক, নৈতিক এবং পারিবারিক উৎকর্ষের জন্য এই পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানি স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত বলে এতে সরস আখ্যানের ঢং বজায় রেখে অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিগর্ভ গল্প ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার আরম্ভে এইরূপ লিখা থাকত : "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক। তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"[৩৬]

এই পত্রিকা মোট চার বৎসরকাল চলেছিল (১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ—১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ)। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকার ১ম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫ খ্রী.) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। অবশ্য 'আলালের ঘরের দুলাল' এতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি, ২৭ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।[৩৭] পরে সর্বমোট ৩০ অধ্যায় সম্বলিত 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শুধু সারস্বত সাধনাই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায়ও প্যারীচাঁদের দক্ষতা ও সাফল্য শ্লাঘার সঙ্গেই স্মরণীয়। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর পিতাও কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডী ইত্যাদির লেনদেন করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে-ছিলেন। এদিক দিয়ে প্যারীচাঁদকে পিতার কৃতিত্বের সার্থক উত্তরাধিকারী বলা চলে। তিনি ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহযোগে 'কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোং' নামে আমদানী রপ্তানী কার্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তারাচাঁদ ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পর বছর জানুয়ারী থেকে কালাচাঁদ ও প্যারীচাঁদ মিলে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে কালা-চাঁদের মৃত্যু হলে পরে ব্যবসার কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। তারপরে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচাঁদ দুই পুত্রকে অংশী করে 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে পুনরায় কারবার চালাতে থাকেন। তিনি ব্যবসার দ্বারা প্রায় দশলক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন।[৩৮] তাঁর স্বাভাবিক সাধুতা ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে তিনি গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল কোং লিঃ; পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং; হাওড়া ডকিং কোং লিঃ ইত্যাদি বহু বিদেশী কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি চায়ের

---

৩৬ 'বাংলা সাময়িক পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৩৭ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ।/০

৩৮ দীনেশচন্দ্র সেন, 'প্যারীচাদ মিত্র', পূর্বোক্ত পৃ. ১২৩

ব্যবসাও ভাল বুঝতেন। তাই বেঙ্গল টী কোং; ডারাং টী কোং লিঃ তাঁকে বোর্ডের ডিরেক্টর নির্বাচন করেছিল।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ উদরী রোগে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র (অমৃতলাল মিত্র, চুণিলাল মিত্র, নগেন্দ্রলাল মিত্র) ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর সহধ্যায়ী বন্ধুগণ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' হলে এক শোকসভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় প্যারীচাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি 'স্মৃতি-সমিতি' গঠিত হয়। 'স্মৃতি-সমিতির' প্রযত্নেই দুই হাজার দুইশত আটষট্টি টাকা ব্যয়ে প্যারীচাঁদের একটি মর্মর নির্মিত প্রতিকৃতি টাউন হলে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৯]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার (১৮১৪–১৮৫৪ খ্রী.)

বাংলার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী এক পুণ্যলগ্ন। এই শতাব্দীতে সমগ্র বাংলা-দেশে এক নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁস প্রভাবিত[৪০] এই নব-জাগরণের যে সমস্ত যুধ্যমান কর্মীপুরুষ দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যেই ছিল সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা। রামমোহন, ডিরোজিও, ভবানীচরণ, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই যুধ্যমান মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের বিচিত্র সমাজসংস্কার আন্দোলনের আবহাওয়ায়ই প্যারীচাঁদ মিত্র লালিত হন। এজন্যে তাঁর সংস্কার চেতনার স্বরূপ অনুধাবন করার জন্যে এ সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের কর্মীগণের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই স্মরণ করা যায় রাজা রামমোহন রায়ের কথা। আবহমানকাল ধরে ধর্মের নামে যে মানবতার বিকৃতি সমাজে চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে এই অকুতোভয় বীরপুরুষই সর্বপ্রথম তীব্র প্রতিবাদ তুললেন। এজন্যে তাঁকে সমাজসংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে আখ্যায়িত করতে হয়। প্রথম বয়সে আরবী-ফার্সীর জ্ঞান আহরণকালেই তিনি একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং পৌত্তলিকতার প্রতি হয়ে ওঠেন বিদ্বিষ্ট। এর পরিচয় মেলে তাঁর ষোড়শ বৎসর বয়সে রচিত (১৭৯০ খ্রী.) 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিকধর্ম-প্রণালী' এবং ১৮০৩-'০৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন' নামক গ্রন্থদ্বয়ে।[৪১] এছাড়াও বিভিন্ন বেদ-উপনিষদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর

---

৩৯ 'প্যারীচাঁদ মিত্র', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১

৪০ সুশীলকুমার গুপ্ত, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ" (কলিকাতা : এ মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৩৬৬), পৃ. ভূমিকা, ৸/০

৪১ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : সুর এণ্ড কোং. ১৮৯৭), পৃ. ১৮, ৪১

একেশ্বরবাদী মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর এই সংস্কার প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী।

রামমোহনের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা একটা তীব্র আন্দোলনের রূপ নেয় কোলকাতায় স্থায়ী অধিবাসী হবার পর থেকে। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি কোলকাতায় স্থায়ী অধিবাসী হন।[৪২] তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। তিনি এই সময় থেকেই তাঁর সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন স্বদেশের হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করেন। রামমোহন ইতিপূর্বে যদিও কোলকাতায় দীর্ঘকাল বাস করেছেন কিন্তু এতদিন কোলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল সম্পূর্ণ ব্যবসাগত। আর এবারের প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন। রংপুরে ডিগ্‌বীর অধীনে চাকুরীরত থাকার সময় স্বদেশের সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করার জন্য যে সাধনার তিনি সূত্রপাত করেন, কোলকাতায় এলেন তারই পূর্ণ পরিণতির আশায়।[৪৩]

রামমোহন কোলকাতায় এসে 'আত্মীয়-সভা' (১৮১৫ খ্রী.) নামে একটি সভা স্থাপন করেন।[৪৪] সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এই সভায় আলোচনা হত। এই সব আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল 'সতীদাহ'। ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজের বুকে যে কত বড় নিষ্ঠুর অনুশাসন জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসতে পারে তার উদাহরণ এই সতীদাহ প্রথা। ধর্মীয় গোঁড়ামির বহ্নিতে ইউরোপের মতো মানুষকে পুড়িয়ে মারা এবং ফিজি দ্বীপের ন্যায় বুড়ো বাপকে রেঁধে খাওয়ার রেওয়াজ সতীদাহের নিষ্ঠুর প্রথার সঙ্গে তুলনীয়।

নিরপরাধ বিধবাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মৃতস্বামীর সঙ্গে চিতায় জীবন্ত পোড়ানো, অথবা বৈষ্ণব হলে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত সমাধিস্থ করা উচিত কিনা এর বিচারের মাপকাঠি ছিল শাস্ত্রের বচন—বুদ্ধি বিবেচনা, মনুষ্যত্ব, স্নেহ, প্রেমের স্থান ছিল না সেখানে।[৪৫] কিন্তু রামমোহন শাস্ত্রের বা প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথাকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি সমাজের এই অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুললেন। "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ" (প্রথম ও দ্বিতীয় সম্বাদ) নামক গ্রন্থে তাঁর এ প্রতিবাদের পরিচয় মিলবে। এখানে তিনি 'নিবর্ত্তকের' পক্ষ অবলম্বন করে 'প্রবর্ত্তকের' সঙ্গে তার্কিকের ন্যায় যুক্তির মাপকাঠিতে তর্ক করেছেন। যেমন, "কেবল ভাবী-আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দ্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতেছে তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু ব্যভিচার আশঙ্কা পতি বর্তমান থাকিতেই বা কোন্ না আছে বিশেষতঃ পতি দূরদেশে থাকিলে ঐ আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছে"।—নিবর্ত্তকের বক্তব্য।[৪৬]

---

৪২ "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৪৩ মদনমোহন গড়াই, "রামমোহন: সময়-জীবন-সাধনা" (কলিকাতা: দাসগুপ্ত এণ্ড কোং. ১৩৭৩), পৃ. ৩৬

৪৪ "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত", পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৪৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য" (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৭২), পৃ. ৩১০

৪৬ রামমোহন রায়, 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ', (প্রথম সম্বাদ), দ্রষ্টব্য: "রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" (কলিকাতা: আদিব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রালয়, ১৩২১), পৃ. ১৭৮

এছাড়াও ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সহমরণ বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানির নাম 'অনুষ্ঠান, সহমরণ বিষয়।' এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, দীর্ঘ দিনের এই ভয়াবহ কুসংস্কার 'সতীদাহ-প্রথা' উচ্ছেদের জন্য ইতিপূর্বে আরও কয়েক-বার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মোঘল সম্রাট আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করার চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রীস্টান মিশনারীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। দেশীয়দের মধ্যে অতঃপর রামমোহন তীব্র আন্দোলনের সূচনা করেন। মিশনারী ও দেশীয়দের এই যুক্তপ্রয়াসের ফলে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।[৪৭] অবশ্য রক্ষণশীল হিন্দুরা এই সংস্কারকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁরা 'ধর্মসভা' (১৭ই জানুয়ারী, ১৮৩০) স্থাপন করে সতীদাহ প্রথার সপক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগলেন।[৪৮]

যাই হোক, সতীদাহ নিবারণের ফলে বাংলার নারীর মৌল অধিকারের পৃথক অস্তিত্বের মর্যাদা এই কথঞ্চিৎ স্বীকৃত হল। এই স্বীকৃতির পথ বেয়েই আধুনিক বাঙালী সমাজে ধীরে ধীরে ঘটেছে নারী ব্যক্তিত্বের মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠা। সতীদাহ নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন রায়ের বৈপ্লবিক প্রয়াস নিরস্ত হয়নি। তিনি বহু-বিবাহ ও কৌলীন্য এবং কন্যাপণ বিরোধী আন্দোলনও উপস্থিত করেন। তাছাড়া নারীর বৈষয়িক উত্তরাধিকারের দাবিও তিনি জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন। নারী যাতে পিতার এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারে তার জন্য তিনি ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের দিকে রীতিমত আন্দোলন শুরু করেন।[৪৯] যদিও তাঁর সময়ে এ ধরনের আইন পাশ করানো সম্ভব হয়নি; তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে, পরবর্তীকালে ইংরেজী শিক্ষিত নব্যবঙ্গসমাজে এই দাবির নৈতিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। আর এখানেই রামমোহনের আন্দোলনের সার্থক ফলশ্রুতি।

রামমোহন শিক্ষার ব্যাপারেও সংস্কার সাধন করেন। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি ছিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপনে তাঁর পরোক্ষ কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা ঐতিহাসিক। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত কলেজের অসারতা প্রতিপাদন করে তিনি ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন।[৫০] তাঁর মতে সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী যথার্থ শিক্ষা বিস্তারের প্রতিবন্ধক। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদির চর্চা করে বাংলাদেশও ইউরোপীয় জাতিসমূহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হতে পারে। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র মত প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। বরং ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজ ব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'অ্যাংলো হিন্দুস্কুল' (Anglo-Hindu School) নামে একটি ইংরেজী স্কুলও তিনি স্থাপন করেন।[৫১]

---

৪৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", ৩য় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : ১৩৮১), পৃ. ৩৪১

৪৮ "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৪৯ A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social change in Bengal* (Leiden, Netherlands, 1965), P. 39

৫০ *Ibid*, P. 40.

৫১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ১৬, প্রথম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা : ১৩৫৩), পৃ. ৫৯

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে রামমোহন তাঁর একেশ্বরবাদী মতকে প্রচার করেন। তাঁর এই প্রয়াস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চলেছিল। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট তারিখে এই মত প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এরই নাম 'ব্রাহ্মসমাজ'।[৫২] পরবর্তীকালে এই 'ব্রাহ্মসমাজ' একটি নূতনতর রূপ পায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠানটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সে হ'ল 'হিন্দুকলেজ'। হিন্দুকলেজকে কেন্দ্র করেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। আর একথা নিঃসন্দেহ যে, বাঙালীর মধ্যে আত্মসচেতনতার প্রথম পূর্ণায়ত উন্মেষও ঘটে ইংরেজী শিক্ষার ফলেই। মুখ্যতঃ এই জ্ঞানতীর্থকে কেন্দ্র করেই উদীয়মান তরুণ গোষ্ঠীর মানসপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারেরও উজ্জ্বলতম অধ্যায় সূচিত হয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। মোটকথা, হিন্দুকলেজ 'বাঙালী রেনেসাঁসের পটভূমি'।

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩] এর প্রতিষ্ঠাবধি যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন তাঁদের অনেকের নামই আজ ইতিহাসের শুষ্কপাতায় আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু যাঁর নাম বাঙালী আজও শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে সে হ'ল তরুণ শিক্ষক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি কেবল হিন্দু কলেজের একজন প্রতিভাবান অধ্যাপকই ছিলেন না,—তিনি ছিলেন সেদিনকার উদীয়মান বাংলার এক অতি দীপ্ত অগ্নিশিখা। সমকালীন বাংলার সমাজবিপ্লবের ইতিহাসে তিনি রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরেরই স্বগোত্র।[৫৪] তিনি ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হন।[৫৫] তিনি ছিলেন ইতিহাসের ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর প্রয়াস নিছক শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সকল ছাত্রের মধ্যে যাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটানো যায় তার জন্যে তিনি নিজের বাসভবনে সকল ছাত্রদের এনে জড়ো করতেন। তাঁদের নিয়েই ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'।[৫৬]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হতো। সাহিত্য, ইতিহাস, অদৃষ্টবাদ, আস্তিক্য ও নাস্তিক্যবাদ, স্ত্রীশিক্ষা, স্বদেশপ্রেম, মানবসেবা ইত্যাদি কোনো বিষয়ই আলোচনায় বাদ পড়ত না।[৫৭] সাধারণতঃ কোনো একটি বিষয় তুলে ডিরোজিও ছাত্রদের সেই বিষয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বলতেন এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে ঐ প্রসঙ্গের সপক্ষে বিপক্ষে মনীষীদের যুক্তি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন। এমনি করে স্বাধীন চিন্তাশক্তি চালনার ফলে ছাত্ররা মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা লাভ করত। ফলে, উত্তরকালে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যেরা (ইয়ংবেঙ্গল দল) যা' সত্য বলে বুঝেছে তাকে কোন দিন হেয় করেনি।

---

৫২ 'রামহোহন রায়' "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৫৩ "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৫৪ "বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা", দ্বিতীয় পর্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৫৫ 'সমাচার দর্পণ', ১৩ই মে, ১৮২৬: সংকলিত, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৫৬ A. F. Salahuddin Ahmed, P. 41

৫৭ "ডিরোজিও", পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

সমাজের বিভিন্ন অনাচার দূরীকরণে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন। এখানেই ডিরোজিওর শিক্ষার ঐতিহাসিক ফল।

কিন্তু ডিরোজিওর প্রয়াসের পরিণাম লক্ষ্য করে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ রুষ্ট হল। নীতিহীনতার অপবাদ দিয়ে তাঁকে হিন্দুকলেজ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তিনি হিন্দুকলেজ থেকে পদত্যাগ করেন।[৫৮] পাঁচ বছর কাল তিনি শিক্ষকের পদে ব্রতী ছিলেন। হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করে এলেও অচিরেই ডিরোজিও বৃক্ষের ফল ফলতে শুরু করল। তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্যরা পরবর্তীকালে 'ইয়ংবেঙ্গল' বলে পরিচিত হন।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এই 'ইয়ংবেঙ্গল'দের প্রয়াস ছিল আরো প্রাগ্রসর। ডিরোজিওর জীবিতকালেই তাঁর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ইয়ংবেঙ্গল দল 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক বের করেন। এর প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।[৫৯] প্রথম সংখ্যাতেই দু'টি বিতর্কিত বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তা' হল : 'ভারতে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাস' ও 'স্ত্রীশিক্ষা'। হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনাচার এবং পুলিশ ও আদালতে উৎকোচ গ্রহণের বাহুল্য প্রভৃতি বিষয়ের নিন্দা করেও টিপ্পনী লেখা হয়। পরবর্তীকালে ডিরোজিওর সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী দেশের আর্থিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষাগত আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন সভাসমিতি করে তাঁদের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করব ইয়ংবেঙ্গলদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' (The Society for the Acquisition of General Knowledge)-র কথা। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬০] তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন এর সভাপতি। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মানসিক উন্নতি সাধন। সভার উদ্বোধনীতে যে প্রস্তাব পঠিত হয়েছিল তাতে সে কথারই উল্লেখ আছে।[৬১]

এই সভার মাসিক বৈঠকে সমাজের বিবিধ দিক নিয়েও লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ হোত। ইয়ংবেঙ্গলদের সংস্কার প্রয়াস কত বহুধা-বিস্তৃত ছিল, এই সভায় পঠিত তাঁদের বিভিন্ন প্রবন্ধের পরিচয় নিলেই তা' আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এখানে সংক্ষেপে তার একটা তালিকা প্রণয়ন করা গেল : ১. Reform, Civil and Social : (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত) ; ২. A Sketch of the Condition of the Hindu Women ; (মহেশচন্দ্র দেব লিখিত) ; ৩. On Native Female Education ; (প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত) ; ৪. On Knowledge (গৌরমোহন দাস লিখিত)।[৬২]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার পক্ষ থেকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে 'Native Female Education' নামে

---

৫৮ 'সমাচার দর্পণ', ৭ মে ১৮৩১, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত (৩য় সংস্করণ, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬), পৃ. ১৫

৫৯ "ডিরোজিও", পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৬০ *Awakening in Bengal in early nineteenth Century*, Vol. One P. Lvii

৬১ *Ibid*, PP. Lvii—LIX.

৬২ *Ibid*, PP. 182, 89, 273, 68.

একটি ইংরেজী রচনা লিখে পুরস্কার পান। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে উক্ত সভার অন্যতম উদ্যোক্তা রামগোপাল ঘোষ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের একটি সোনার ও রূপার পদক পারিতোষিক ঘোষণা করেন। প্রথম পুরস্কার পান মধুসূদন দত্ত এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পান ভূদেব মুখোপাধ্যায়।৬৩

মোট কথা, নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ইয়ংবেঙ্গলদের প্রয়াস ছিল অপরিসীম। আত্মার সঙ্গিণী নারী যদি সাহচর্য দেয় তাহলে পুরুষ চিত্তে পাবে বল আর এ জন্য নারীর চিত্তেও জ্ঞানের নির্মল আলোক ছড়িয়ে দিতে হবে। ইয়ংবেঙ্গল উদ্যোক্তারা এ কথা ভাল করেই বুঝেছিলেন। তাই তাঁদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় দিকে দিকে গড়ে ওঠে বালিকা বিদ্যালয়।৬৪ বিশেষ করে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়াস সারা বাংলায় ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ইয়ংবেঙ্গলদের সংস্কার প্রচেষ্টার পরবর্তী ফল 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ। এতদ্দেশীয় জনগণের 'জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধির' অভিপ্রায়েই তারা এসব পত্রিকা প্রকাশে উদ্যত হন। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়েও এই সমস্ত পত্রিকায় সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করা হোত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণ' (দ্বিভাষী সাপ্তাহিক) রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (দ্বিভাষী) মাসিক প্রকাশিত হয় ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। সম্পাদক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ।৬৫

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজের' (আদি ব্রাহ্মসমাজ) সংস্কার ঘটে এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজকে সর্বজনীন করে যেতে পারেননি। কি করে এই সর্বাঙ্গীন ধর্মসাধন করা যায় তার কোন পদ্ধতি তিনি স্থির করে যাননি। দেবেন্দ্রনাথই সেই অসমাপ্ত কর্মের ভার নেন। তাঁর সে কর্মগুলিকে নিম্নভাবে সাজানো যেতে পারে, (১) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ প্রণালী; (২) ব্রাহ্মধর্ম-সঙ্গত উপাসনা পদ্ধতি; (৩) ব্রহ্মসঙ্গীতের বিস্তার; (৪) নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ইত্যাদি।৬৬

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারসাধন করে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত সভার নাম দিলেন 'তত্ত্বরঞ্জিণী সভা'। দ্বিতীয় অধিবেশনে নূতন নামকরণ হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তাঁর স্বীয় বাসভবনে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।৬৭ ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রচার ছাড়াও বাঙালীর আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ বিষয়েও আলোচনা হোত। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়; (১৭৬৫ শক, বৈশাখ। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট)।৬৮

---

৬৩ বিনয় ঘোষ, "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", ৩য় খণ্ড (কলিকাতা: ১৩৬৬), পৃ. ১১৬

৬৪ দেওয়ান কার্তিকেয় রায়, "আত্মজীবন চরিত", (কলিকাতা: ১৩৩৬) পৃ. ৫৭

৬৫ "বাংলা সাময়িক পত্র", প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯, ৭৭

৬৬ ঈশানচন্দ্র বসু, "শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয়" (কলিকাতা: ১৯০২), পৃ. ৩৯

৬৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর", 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা': ৪৫, ৩য় খণ্ড (২য় সংস্করণ, কলিকাতা: ১৩৫৩), পৃ. ১৯

৬৮ "বাংলা সাময়িক পত্র", প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

এ পত্রিকাতেও বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি দেশের কল্যাণকর সকল বিষয়েরই আলোচনা প্রভৃতি স্থান পেত। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমাবধিই এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বঙ্গদেশের উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের সমাজসংস্কার প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রতিটি রচনাই ছিল উদ্দেশ্যমূলক। সমকালীন ধর্ম ও সমাজবোধ প্রসূত নীতিবোধের ধারাটি তাতে একান্তভাবেই স্পষ্ট। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (দুইখণ্ড) নামক গ্রন্থের কথাই ধরা যাক। সেখানে কোন্ নিয়মানুসারে চললে কিরূপ উপকার ও কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করলে অপকার ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের বিচার-মীমাংসা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বাহ্যবস্তুর প্রথমভাগের উপসংহারে 'সুরাপান' এবং দ্বিতীয়ভাগের শেষে 'আমিষভোজন' এই দু'টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৬৯]

ধর্মনীতি নামক পুস্তকের মধ্য দিয়েও তাঁর সংস্কার প্রয়াস প্রকটিত হয়েছে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৭০] এছাড়াও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তিনি বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন।[৭১] তৎকালে সমাজের উপর যে নীলকরদের নিষ্পেষণ চলেছিল সে সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সদাসচেতন। তাঁর এ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৭৭২ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' নামক প্রবন্ধে।

তিনিই প্রথম বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন উত্তম ভূগোল ছিল না। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র বালকদের শিক্ষার্থে একখানি ভূগোলও রচনা করেন।

শুধু লেখনীর মাধ্যমেই নয়, বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকেও অক্ষয়দত্ত সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তন্মধ্যে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের বাড়ীতে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।[৭২] স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ বর্জন, বহুবিবাহ রোধ এবং চড়ক পূজা সংক্রান্ত নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ সাধন ব্যাপারে সমিতির ছিল অগ্রণী ভূমিকা। এমন কি ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সমিতি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা'য় সর্বপ্রথম আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।[৭৩] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভাপতি ছিলেন।

---

৬৯ নবেন্দু সেন, "গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭১), পৃ. ১৮৭

৭০ মহেন্দ্রনাথ রায়, "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত" (কলিকাতা : ১২৯২), পৃ. ১৪৭

৭১ অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বিধবা বিবাহ', "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", একাদশ বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা (চৈত্র, ১৭৭৬ শক), পৃ. ১৫৭

৭২ "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র," পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৭৩ ঐ, পৃ. ১০০

সমাজসংস্কার প্রয়াসের এই ধারায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা আলোচনার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিমানসের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। 'বিদ্যাসাগর চরতে' রাইমণির সুধাস্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন :

"ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতি বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"[৭৪]

সত্যিই, রাইমণির সুধাস্নিগ্ধ মাতৃস্নেহই তাঁকে নারীজাতির প্রতি পক্ষপাতি করে তুলেছে। নারীর ক্লেশে তিনি হয়েছেন দুঃখিত। সমাজের অনুশাসনে, কৌলীন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সমাজের বহু নারীর ভাগ্যে ঘটে অকালবৈধব্য। ফলে, বাল্য-বিধবার সংখ্যাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। কিন্তু বিধবার বিবাহের কোন ব্যবস্থাই সমাজে ছিল না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্মার্ত পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর নারীর এই বৈধব্য যন্ত্রণা দেখে ব্যথিত হলেন। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা রাজবল্লভ নিজের বিধবা কন্যার দুঃখে ব্যথিত হয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়নি। যাই হোক, বিদ্যাসাগর দেখলেন যে সমাজের যাঁরা ধারক ও পোষক তাঁরা শাস্ত্রের কথায় ওঠে এবং বসে। কাজেই তাঁদেরকে স্বমতে আনতে হলে শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্য নেওয়া দরকার। তাই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদাহরণ তুলে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁর এই শাস্ত্রসম্মত যৌক্তিকতার পরিচয় মিলবে।

তবে তাতেও রাতারাতি কোন সুফল ফলল না। বরং গোঁড়া সমাজপতিরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গেলেন। বিদ্যাসাগর তাই শাস্ত্রীয় আলোচনার স্তর থেকে বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়াশীল স্তরে আনতে চেষ্টা করলেন। তিনি স্পষ্টতঃই বুঝেছিলেন যে বিবধাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজন। তাই একসময় শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রতিপাদনের জন্য যেমন শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনে নেমেছিলেন তেমনি বিধবাবিবাহ আইন পাশের জন্য আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহে নামলেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরসহ সে আবেদনপত্রটি তিনি ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন।[৭৫] তাঁর সে আবেদনে সাড়া দিয়েই ভারত সরকার ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই

---

৭৪ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, "বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার" (৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা: ১৩৭১), পৃ. ৩৩৬-৩৭

৭৫ "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

বিধবাবিবাহ আইন পাশ করেন।[৭৬] এইভাবেই বিদ্যাসাগরের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় সমাজের এক অভূতপূর্ব সংস্কার সাধিত হয়।

বহুবিবাহ রোধের ব্যাপারেও তিনি আন্দোলন করেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের কুলবৃত্তি ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে ওঠার ফলে তাঁদের দেখা দেয় চরম আর্থিক দুর্গতি। শেষ পর্যন্ত বহুবিবাহ করে তাঁরা আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেন। কেননা, তখন পণ প্রথার প্রচলন ছিল। মোট কথা, দারিদ্র্য ও অভাব অনটন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাবার এক অতি সহজ পন্থা হয়ে ওঠে বহুবিবাহ। কিন্তু এই প্রথা ছিল সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সে কথা বুঝতে পেরে বিদ্যাসাগর এর কুফল প্রতিপাদন করে 'বহুবিবাহ' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) নামক পুস্তক রচনা করেন। এমনকি আইন দ্বারা বহুবিবাহ রোধ করার আবেদন জানিয়ে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ভারত সরকারকে এক পত্র পাঠান।[৭৭] অবশ্য তাঁর সে আবেদন কার্যকর হয়নি।

তবুও বলতে হয় যে, সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তাঁর আন্দোলন অনেকখানি সার্থক হয়েছে। তাঁর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজে বহুবিবাহ নিবারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পায়। ধীরে ধীরে সমাজ থেকে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা লোপ পায়।

এবারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হ্যানা ক্যাথারীন মুলেন্‌সের সংস্কার প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বর্তমান প্রসঙ্গের যবনিকা টানব। ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমাজে যে এক শ্রেণীর অর্থশালী 'বাবু' জন্ম নিয়েছিল তাঁদের অমিতাচারের ও স্ত্রৈণতা দোষের স্পষ্ট ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রী.) ও 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১ খ্রী.) নামক গ্রন্থদ্বয়ে।[৭৮] এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত অতটা ইতিবাচক না হলেও সমাজের যে কিছু একটা সংস্কারসাধন, তাতে সন্দেহ নেই।

হ্যানা ক্যাথারীন মুলেন্‌স বিদেশী লেখিকা হলেও তাঁর সংস্কার প্রয়াস নেহাত কম নয়। যদিও খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নের জন্যই তিনি 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮২৫ খ্রী.) লেখেন। কিভাবে সৎ ও সততা অবলম্বন করে একটি পরিবার সুখী সমৃদ্ধ হ'তে পারে, অপরপক্ষে অন্যায় ও দুর্নীতি অবলম্বন করলে কি ঘোর বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, তারই বিবরণ দিয়েছেন লেখিকা।[৭৯]

সমাজসংস্কারের এই বিচিত্র প্রয়াসের মধ্য দিয়েই প্যারীচাঁদ মিত্রের মানসভূমি পরিপক্কতা লাভ করে। রামমোহন, ডিরোজিও থেকে শুরু করে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের বিভিন্ন সংস্কার তৎপরতা তাঁর যৌবনপর্বেই ঘটে। এমনকি তৎকালীন উদীয়মান তরুণগোষ্ঠীর মতো তিনিও সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় নেমে পড়েন।

---

৭৬ "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ," ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৭৭ ঐ, পৃ. ২৩৫

৭৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়', "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" : ৪, প্রথম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪), পৃ. ২৫, ২৯

৭৯ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" (চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা : ১৩৬৯), পৃ. ২৫-২৬

তৃতীয় অধ্যায়

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজসংস্কারমূলক কার্যকলাপ (১৮৩৫—১৮৮১ খ্রী.)

কেবলমাত্র গ্রন্থ রচনাই নয়—প্যারীচাঁদ মিত্র বিভিন্ন রকম সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে সংস্কার চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে। ছোট ছোট বালক-বালিকাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি স্বীয় ভবনে এক 'অবৈতনিক বিদ্যালয়' খোলেন। এই 'অবৈতনিক বিদ্যালয়ে'র তিনিই ছিলেন আবার প্রধান শিক্ষক।[৮০] তাঁর মন ছাত্রাবস্থাতেই কিরূপ সমাজসচেতন হয়ে উঠেছিল, অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে ইয়ংবেঙ্গলদের উদ্যোগে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (The Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮১] এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুবকবৃন্দের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যাপারে এই সভা সহায়তা করে। প্যারীচাঁদ প্রতিষ্ঠাবধিই এই সভার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপরে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (On Native Female Education) পাঠ করেন। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে উল্লিখিত প্রবন্ধে।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বেথুন (বীঠন) সাহেবের অবদান অবিস্মরণীয়। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনই তার অন্যতম প্রমাণ। প্যারীচাঁদ এই বেথুন সাহেবের অন্যতম সহযোগী ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। বেথুনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে 'বেথুন সোসাইটি' (Bethune Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা ও সংস্কৃতিমূলক সমস্যার আলোচনা হোত। প্যারীচাঁদ এই সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

প্যারীচাঁদের সমাজসংস্কারের সার্থকতম ফলশ্রুতি 'মাসিক পত্রিকা' পরিচালনা। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে রাধানাথ সিকদারের সহযোগিতায় তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৮২] স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের সৌজন্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত হোত। পত্রিকার মুখবন্ধে এইরূপ লিখা থাকত: "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"[৮৩] বলা বাহুল্য 'মাসিক পত্রিকা'কে অবলম্বন করেই

---

৮০ "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮১ *Awakening in Bengal in early nineteenth Century*, Vol. One. P. LV.

৮২ "বাংলা সাময়িক পত্র", প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৮৩ ঐ, পৃ. ১৩৫

প্যারীচাঁদের সংস্কার প্রয়াস ব্যাপকতা লাভ করে। তাঁর সমাজসংস্কারমূলক অধিকাংশ রচনাই 'মাসিক পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। চার বছর প্রকাশের পরে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

তৎকালীন সমাজে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছিল। 'সমাজ উন্নতিবিধায়িণী সুহৃদ্ সমিতি'র উদ্যোগে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ রোধের ব্যাপারে 'ভারতীয় ব্যাবস্থাপক সভা'য় সর্বপ্রথম আবেদন পত্র পেশ করা হয়।[৮৪] প্যারীচাঁদ সেই আবেদন পত্রে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।[৮৫] এমন কি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে কোলকাতায় যে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, প্যারীচাঁদ সে অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন।[৮৬]

এছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্র মদ্যনিবারণ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মদ্য-নিবারণ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন প্যারীচরণ সরকার। বাংলাদেশ থেকে যাতে সুরাপান চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৩ সালের ১৫ই নভেম্বর 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) স্থাপন করেন।[৮৭] প্যারীচাঁদ প্রতিষ্ঠাবধিই এর একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। এমন কি প্যারীচাঁদেরই উদ্যোগে মদের অবাধ বিক্রয় বন্ধের জন্য ১৮৬৫ সালে এই সভা কর্তৃক সরকারের নিকট একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয়। ১৮৭৫ সালে অবশ্য এই আবেদন কার্যকর হয়েছিল।[৮৮]

কিন্তু তবুও বলতে হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেও তিনি সব সময় উদারতার পরিচয় দিতে পারেননি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জানের ভাষায়, "সহমরণে উৎসাহ, বিধবাবিবাহে বিরোধিতা—তাঁর রক্ষণ-শীলতাকেই প্রতিষ্ঠা করে। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থে আগড়ভম ও এক বিধবা রমণীকে নিয়ে যে কৌতুক করা হয়েছে স্পষ্টতঃই তা বিধবা বিবাহ বিরোধিতা। ---পরবর্তী রচনায় প্যারীচাঁদের বিধবা-বিবাহ বিরোধিতা স্পষ্টতর আকার পেয়েছে। 'অভেদী'তে তিনি সহমরণ প্রথার প্রতি সহানুভূতিশীল। --- সহমরণের মর্মান্তিক দৃশ্যকেও মনোহর করে চিত্রিত করতে বাধ্য হন"।[৮৯]

সহমরণ ছাড়া তিনি আবার কোথাও কোথাও বিধবা রমণীর ব্রহ্মসাধনাকে সমর্থন করেছেন। যেমন, 'অভেদী'তে দেখি বিধবা 'সরলা'র কাছে যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন সে তা' শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি—সঙ্গে বলেছে: "যাহারা ঈশ্বরপরায়ণা নারী তাঁহারা শারীরিক সুখার্থে জীবন ধারণ করেন না—তাঁহারা আত্মসংযম ও আত্মোন্নতির

---

৮৪ "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

৮৫ ঐ, পৃ. ১০৭

৮৬ ঐ, পৃ. ১০৯

৮৭ নবকৃষ্ণ ঘোষ, "প্যারীচাঁদ সরকার" (কলিকাতা: সাহিত্য সেবক সমিতি, ১৩০৯), পৃ. ৯৯

৮৮ ঐ, পৃ. ১০৯--১১১

৮৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ভূমিকা, 'প্যারীচাঁদ-মানস', "প্যারীচাঁদ-রচনাবলী," পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

জন্য জীবিত থাকেন। অতএব ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে অন্য কি উপায়ে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে?''[৯০]

আসলে ''প্যারীচাঁদের এই মানসিকতা গভীর বিশ্বাসজাত''।[৯১] স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি থিয়সফিতে অনুরাগী হয়ে পড়েন এবং আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আর আত্মাকে 'অমলিন অকলঙ্ক' রাখার জন্যই তিনি সহমরণে উৎসাহী ব্রহ্মচর্যসাধনায় আস্থাশীল।[৯২]

যাই হোক, প্যারীচাঁদের মানসিকতার এই স্ববিরোধের কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যে, তিনি ছিলেন মূলতঃই একজন প্রগতিশীল সমাজসংস্কারক।

চতুর্থ অধ্যায়

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজসংস্কারমূলক রচনা : (১৮৫৪—১৮৮১)

ক. নক্সাজাতীয় রচনা :

১. আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮ খ্রী.)

স্ত্রীজাতির নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহযোগিতায় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট থেকে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন।[৯৩] 'মাসিক পত্রিকা'কে ভিত্তি করে প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা একটা আনুষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ রচনাই এতে প্রকাশ পায়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায় 'রামারঞ্জিকা', আর প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫ খ্রী.) 'আলালের ঘরের দুলাল'।[৯৪] সুকুমার সেন তাই 'রামারঞ্জিকা'কেই প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম রচনা বলে অভিহিত করেছেন।[৯৫] কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের দিক দিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম রচনা। 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৯৬]

'আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্দেশ্যমূলক রচনা। গ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়েও এর উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়ে। এ সম্পর্কে লেখকও তাঁর গ্রন্থের প্রচার-

---

৯০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত ''প্যারীচাঁদ রচনাবলী'', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

৯১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্যারীচাঁদ মানস', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৯২ ঐ, পৃ. ১৫-১৬

৯৩ ''বাংলা সাময়িক পত্র'', প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৯৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ''প্যারীচাঁদ রচনাবলী'', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৯৫ সুকুমার সেন, ''বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'', ২য় খণ্ড, (ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা : ১৩৭৭) পৃ. ১৯১

৯৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''প্যারীচাঁদ মিত্র'', পৃ. ১৯২

ধর্মিতার কথা স্বীকার করে নিয়ে ভূমিকায় বলেন, "It chiefly treats of the Pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self formation and religious culture and partly of the state of things in the Moffussil."[৯৭]

প্যারীচাঁদ মিত্রের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে তাঁর মানসের একটা পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুতঃই 'আলালের' কাহিনীর অবতারণা করে তিনি একটা নীতিশিক্ষা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। বাবুরাম বাবুর প্রথম পুত্র মতিলাল বাল্যকাল থেকেই পিতামাতার অধিক প্রশ্রয় পেয়ে বকাটে হয়ে পড়ে, তার মধ্যে কোন প্রকার নৈতিক শিক্ষা ছিল না। এরই পাশাপাশি আদর্শ গুরু ও শিক্ষকের সাহচর্যে বেড়ে ওঠা বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রামলাল নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। লেখক যেন পাশা-পাশি এই দুই বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করে আমাদেরকে রামলালের মতো আদর্শ চরিত্র-বান হওয়ার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্যই ঘটনার এত পল্লবায়ন। এর এক কোটিতে মতিলালেরই দোসর হলধর, গদাধর, বাঞ্ছা-রাম, ঠকচাচা এবং অন্য কোটিতে রামলাল, বরদাবাবু, বেণীবাবু কাহিনীর প্রায় সর্বাংশ জুড়ে আছে।

'আলালের ঘরের দুলাল' তৎকালীন সমাজের এক সার্থকতম প্রতিনিধি। ইংরেজী বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমাজে যে এক চরম নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, বিলাস ব্যসনের মত্ততায় হঠাৎ ফুলে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ পর্যন্ত কিরূপ গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছিল, লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার বর্ণনা করেছেন। ভুঁয়োদর্শন ব্যাপারে সত্যি সত্যিই প্যারীচাঁদ মিত্রের অভিজ্ঞতার কোন ত্রুটি ছিল না। সমগ্র 'আলালে'র কাহিনী পড়লে একথাই বার বার মনে হয়—তৎসমসাময়িক কোলকাতার সমস্ত অলিতে গলিতে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য; তিনি বলেন: "ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার ও ভাগীরথী তীরবর্তী শহরতলী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু খাঁটি খবর পাই 'আলালের ঘরের দুলালে', সে খবর আর কোথাও পাই না।"[৯৮]

এই 'মধ্যবিত্ত সমাজের খাঁটি খবরে'র স্বরূপ কি? এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলেই প্যারীচাঁদের বাস্তব সমাজ সচেতনতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে। প্রথমেই বাবুরাম বাবুর চরিত্রের কথা ধরা যাক। বাবুরাম বাবু ফৌজদারী আদালতে চাকুরী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। চলাফেরা, পোষাক পরিচ্ছদে তাঁর মধ্যে এক বাবুয়ানি ভাব। প্যারীচাঁদ মিত্র বাবুরাম বাবুর বাবুয়ানাকে এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: "বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায় —উদরটি গণেশের মতো—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক গাল পান।"[৯৯] বাবুরাম বাবুর এই জাতীয় চিত্র সে যুগে ছিল একান্ত বাস্তব।

মতিলাল ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের (হলধর, গদাধর, রাম গোবিন্দ, দোল গোবিন্দ) চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদের সমাজ সচেতনতার পরিচয় উচ্চগ্রাম লাভ

---

৯৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৯৮ সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০

৯৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ৬১

করেছে। সুমার্জিত না হলেও একান্তভাবে বাস্তব যে নববাবুদিগের কোলকাত্তাই জীবন তারই যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে মতিলাল ও তার সহযোগীদের চরিত্রে। অবশ্য এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, 'আলালের' কাহিনী যে কালে রচিত হয় ইহা সেই কালের অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সমাজচিত্র নয়। 'আলালে'র কাল আরও পূর্বের।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্যারীচাঁদ "কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার বিবরণ" যেভাবে দিয়েছেন তা এইরূপ: "সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরেজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল,। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দীরাম দাস অনেক ইংরেজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানি-গিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাহার একটি স্কুল ছিল তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। ছেলেরা তামস্‌ডিস্ পড়িত ও কথার মানে মুখস্থ করিত। ...ফ্রেন্‌কো ও আবাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।[১০০]

বলাবাহুল্য যে, এই শরবোরণ স্কুলে মতিলাল কিছুকাল লেখাপড়া করেছিল কিন্তু তার উচ্চশিক্ষা হয়নি। সে কেবল দু'একটি ইংরেজি শব্দ ছাড়া আর কিছুই জানত না। 'আলালে'র কাহিনীতে দেশী শিক্ষার কুফল বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীর যে কয়েকটি আদর্শ চরিত্র বরদাবাবু, রামলাল তাঁরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত। মদ্যপান, লাম্পট্য ও অসামাজিক বেলেল্লাপনাকে আক্রমণ করলেও প্যারীচাঁদ ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার দোষ কীর্তন করেননি। কারণ, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রদূত হিন্দু কলেজেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

যাই হোক, বাল্যকালাবধি সুশিক্ষা না পেয়ে মতিলাল উচ্ছৃঙ্খলতার চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ইত্যাদি সঙ্গীদের সহায়তায় সে গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। তাদের অত্যাচারে পথের পথিকও ভীত সন্ত্রস্ত। "সন্ধ্যার পর বাবুরা দঙ্গল বাঁধিয়া বাহির হন—হয়তো কাহারো বাড়ীতে পড়িয়া লুটতরাজ করেন নয় তো কাহারো কানাচে আগুন লাগাইয়া দেন—হয় তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া শোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান কিম্বা কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন নয় তো কোন কুলকামিনীর ধর্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পান। গ্রামস্থ লোক সকল অত্যন্ত ব্যস্ত, আঙুল মটকাইয়া সর্বদা বলে—তোরা ত্বরায় নিপাত হ।[১০১] উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও এর মধ্য দিয়েই মতিলাল ও তাঁর সঙ্গীদের আচরণের স্বরূপ স্পষ্ট।

এখানেই শেষ নয়। প্যারীচাঁদ এই অপকীর্তদের আচরণের আরও বহু ফিরিস্তি দিয়েছেন 'আলালের ঘরের দুলালে'র বিভিন্ন অধ্যায়ে। যেমন, চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে, 'মতিলাল ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের এক সাথীর অসুখের কথা বলে ব্রজনাথ নামে এক কবিরাজকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসে। কবিরাজ মশায় রোগীর বাড়ীতে এসে অবিলম্বেই টের পেলেন যে এ রোগ কৃত্রিম ভান মাত্র। কবিরাজ তখন কেটে পড়ার ফন্দি খুঁজলেন। কিন্তু ছোঁড়াদের হাত থেকে কি সহজেই রেহাই পাওয়া যায়? ছোঁড়ারা কবিরাজকে কাঁধে করে হরিবোল দিতে দিতে গঙ্গাতীরে নিয়ে এল। পরিশেষে তাঁকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিল না ঠিকই কিন্তু তাঁর সমস্ত ঔষধপত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।'

---

১০০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী," পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

১০১ ঐ, পৃ. ৯৯

এইভাবে মতিলাল ও তার সঙ্গীদের বেলেল্লাপনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে প্যারীচাঁদের ধারণা ছিল অতি তীক্ষ্ণ। মতিলালের মতো চরিত্র কিভাবে ভাল হতে পারে গ্রন্থের শেষে তার একটা ইতিবাচক দিকও তিনি দেখিয়েছেন। যে মতিলাল একদা সঙ্গদোষে পিতামাতার অধিক প্রশ্রয় পেয়ে এবং সর্বোপরি সুশিক্ষার অভাবে অধঃপাতের চরমে পৌঁছেছিল, লেখক তাকেই সৎসঙ্গের সহবাসে, নৈতিক উপদেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ভালোর পথে নিয়ে এলেন। প্যারীচাঁদের সমাজসংস্কারকের ভূমিকা এখানে স্পষ্টতর। ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাসে' আমরা নববাবুদিগের স্ত্রৈণতাদোষ ও অমিতাচারের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু সেখানে 'নববাবু'দের ভাল হওয়ার কোনো পথ নির্দেশিত হয়নি। এখানে প্যারীচাঁদ ভবানী-চরণের চেয়ে একধাপ অগ্রসর।

'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রতি পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সমাজসচেতনতার সুতীব্র অভিব্যক্তি 'ঠকচাচা' সে যুগেরই এক অত্যুজ্জ্বল প্রতিনিধি। তার মতো বাস্তব চরিত্রের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলে। মতিলালের জীবন কাহিনী রচনাই প্যারীচাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, সেদিক থেকে সে-ই এই কাহিনীর নায়ক; কিন্তু উপন্যাসের উত্থানপতন নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠকচাচা। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "সেদিক দিয়া দেখিলে ঠকচাচাই আসল নায়ক, এবং তাহা হইলে বইটি 'পিকারেসক' নভেলের পর্যায়ে পড়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠকচাচা, পুরানো সাহিত্যের ভাঁড়ু দত্তের পাশে তাঁহার স্থান সাহিত্যসৃষ্টির জনবিরল অমরাবতীতে।"[১০২] প্রমথনাথ বিশী বলেন, "কুনীতির মানদণ্ডে ভাঁড়ুদত্ত ও ঠকচাচা যতখানি খাটো সুবাক্যের মানদণ্ডে তাঁহারা ততখানি বড়।"[১০৩] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ভাষায়, "বস্তুতঃ ঠকচাচা তৎকালীন বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের কয়েকটি ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধি।"[১০৪]

ঠকচাচার একটা নাম ছিল, লেখক তা একবার উল্লেখও করেছেন।[১০৫] কিন্তু পরবর্তী সময়ে লেখকের ন্যায় পাঠকও যেন সে নাম ভুলে গেল। আসলে ঠকচাচা ছাড়া হয়ত আর কোনো নাম তার খাটে না। ঠকচাচা জালিয়াৎ ও ফেরেববাজ বদমায়েস। কিন্তু সবশুদ্ধ সে বাস্তব জীবন্ত মানুষ। রামলালকে শিক্ষানুরাগী সংস্কারপন্থী ও সৎ দেখে ঠকচাচার উদ্বেগ শুধু লাভহানির আশঙ্কাজনিত নয়।[১০৬] সে আমাদের অনেকের মতো যথার্থই বিশ্বাস করত, "দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই —দুনিয়া সাচচা নয়, মুই একা সাচচা হয়ে কি করবো?"[১০৭] ঠকচাচার চরিত্রে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, "অদ্ভুত প্রাণধর্মিতা, জীবনরসের অকুণ্ঠ প্রকাশ ক্ষমতা।"[১০৮]

---

১০২ সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯। উদ্ধৃত: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, 'সাহিত্য পত্রিকা', ৩: ১, বর্ষা ১৩৬৬

১০৩ প্রমথনাথ বিশী, "বাংলা সাহিত্যে নরনারী", (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৬০) পৃ. ১৯

১০৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্যারীচাঁদ মানস', "প্যারীচাঁদ রচনাবলী"র ভূমিকা, পৃ. ৮

১০৫ পঞ্চম অধ্যায়ে; ঠকচাচার আসল নাম "মোকাজান মিয়া"।

১০৬ সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০

১০৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ১১৭

১০৮ ঐ, পৃ. ৮

মোকাজান মিয়া ওরফে ঠকচাচা জীবন নির্বাহের জন্য অবলম্বন করেন 'কেতনা ফিকির---কেতনা ফন্দি'। বাস্তব সচেতন প্যারীচাঁদ মিত্র ঠকচাচা চরিত্রের অন্তরমানসে প্রবেশ করে তাই তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই জাতীয় চরিত্রের মধ্যে যে আত্মঅহমিকা বোধ বেশী, সে কথাও প্যারীচাঁদ মিত্র ভুলে যাননি। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তার প্রমাণ মিলবে; "ঠকচাচার নিকট যে আলাপ করিতে আসিতেছে, তাহাকে অমনি বলিতেছে—মুই আবদুর রহমান গুল-মহাম্মদের লেড়খা ও আমপক্ আমপক্ গোলাম হোসেনের পোতা।[১০৭]

ঠকচাচার আত্মঅহমিকার শোচনীয় পরাজয় ঘটে কেবলমাত্র ঠকচাচীর কাছে। ঠকচাচীও ঠকচাচার দলেরই সার্থক প্রতিনিধি—সার্থক সহধর্মিণী। ঠকচাচা কপটতা অবলম্বন করে, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খাটিয়ে অর্থ উপার্জন করেন আর ঠকচাচী তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ, উচচাটন, তুকতাক, জাদুভেল্কি ইত্যাদি ঠকানো বিদ্যা অবলম্বন করে মেয়ে মহলের কাছে থেকে অর্থ উপার্জন করেন। তৎকালীন সমাজে তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ, উচচাটন ইত্যবিধ সংস্কারের ছিল ব্যাপক প্রভাব। প্যারীচাঁদ ঠকচাচীর কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে সে কথাই বলতে চেয়েছেন।

ইংরেজের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এদেশে 'আদালত' ব্যবস্থা চালু হয়। সেই আদালত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে উকিল মোক্তার মুৎসুদ্দি তাঁদের আসন জাঁকিয়ে বসে এবং রাতারাতি তারা হয়ে ওঠে ধনকুবের। বিভিন্ন ফন্দি ফেরেববাজীই তাঁদের হাতিয়ার। হয়কে নয় করতে, নয়কে হয় করতে এদের সাথী মেলা ভার। বস্তুতঃই এঁদের আচরণ সম্পর্কে প্যারীচাঁদ ছিলেন পুরোমাত্রায় সচেতন। 'আলালে'র কাহিনীতে তাঁর এই সচেতনতার পরিচয় বিধৃত।

বটলর সাহেব ফৌজদারী আদালতের উকিল। আর পাঁচজন উকিলের মতো তিনি টাকার লোভে সত্যকে মিথ্যায়, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার কুশলী শিল্পী। মতিলাল বস্তুতঃই অপরাধী কিন্তু---"বটলর সাহেব ফৈরাদির ও ফৈরাদির সাক্ষীর উপর অনেক জেরা করিয়া মতিলাল সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন। এমন কাঁচান আশ্চর্য নহে, কারণ, একে উকিলী ফন্দি, তাতে পূর্বে গড়াপেটা হইয়াছিল—টাকাতে কি না হইতে পারে? কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়।"[১১০]

বটলরের মতো উকিলের যথার্থ মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম। সেও "মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০ টাকা কিন্তু প্রাপ্তির সীমা নাই, বাটীতে নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়।"[১১১] শঠতার আশ্রয় নিতে এবং 'পরের ভিটে নাশ করতে' তার জুড়ি বোধ করি একমাত্র ঠকচাচা। বাঞ্ছারামের খাতিরও ঠকচাচার সঙ্গেই বেশী। বাঞ্ছারামের উক্তি: "কারবারি লোক না হইলে কারবারের কথা বুঝে না। ঠকচাচা যাহা বলিতেছেন তাহাই কাজের কথা। দুই একজন পাকা সাক্ষীকে ভাল তালিম করিয়া রাখিতে হইবে।"[১১২]

---

১০৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ-রচনাবলী," পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

১১০ ঐ, পৃ. ৮৯

১১১ ঐ, পৃ. ৭৭

১১২ ঐ, পৃ. ৭৮

মতিলাল সংক্রান্ত মামলা খালাসের পরে দ্বিতীয়বার যখন আবার আদালত থেকে বাবুরাম বাবুর উপর নালিশ জারি হল, সে খবর শুনে বাঞ্ছারাম আনন্দে আত্মহারা। কেননা, বাঞ্ছারাম ভাল করেই জানে, "—বাবুরামকে এখানে আনাতে একা দুদে কত ক্ষীর ছেনা ননী হইবেক। একবার গাছের উপর উঠাতে পারলেই টাকার বৃষ্টি করিব,"[১১৩] এই জাতীয় চরিত্রের অর্থলিপ্সা কত চরমে পৌঁছাতে পারে তা' উপরিউক্ত বক্তব্যেই স্পষ্ট। আর এ সম্পর্কে প্যারীচাঁদের যে সুতীব্র অভিজ্ঞতা ছিল তা বলাই বাহুল্য।

তৎকালীন সমাজের শিক্ষাবিভ্রাটকেও প্যারীচাঁদ মিত্র সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'আলালের' কাহিনীতে। সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল অজস্র ত্রুটি। তাঁর মতে এই ত্রুটি ত্রিবিধঃ "প্রথমত, ভাল শিক্ষক নাই; দ্বিতীয়ত, ভাল বহি নাই; তৃতীয়ত, কি উপায় দ্বারা (ছাত্রদের) মনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মে তাহা অতি অল্প লোকের (শিক্ষকের) বোধ আছে।"[১১৪] এই ত্রিবিধ ত্রুটির ফলে ছাত্রদের সুশিক্ষা হোত না। তাঁদেরকে কতকগুলি নির্ধারিত বই মুখস্থ করিয়ে তোতা পাখি বানানো হোত—এই তোতা পাখি বানানো ছাড়া যেন স্কুলের আর কোনো ভূমিকা ছিল না। এই জাতীয় স্কুলের মধ্যে কালুস সাহেবের স্কুল অন্যতম। প্যারীচাঁদ এই স্কুলের ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছেন এইভাবে,—"প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না—ভারি ভারি বহি পড়িবার অগ্রে সহজ সহজ বহি ভালোরূপে বুঝিতে পারে কিনা, তাহার অনুসন্ধান হইত না—অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না।..."[১১৫]

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার এই তথ্যঋদ্ধ—প্রাসঙ্গিক বর্ণনার একই অংশে অযোগ্য মুর্খ শিক্ষকের (বক্রেশ্বর বাবু) বিবরণ তৎকালীন যুগসম্ভাবিত,—"বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোনার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হইবে কেন! সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর! ইস্কুলের উপরে ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা, সন্দেহ। বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিক্সনেরি দেখ।"[১১৬]

এই তো গেল শিক্ষাব্যবস্থার ও শিক্ষকের ত্রুটি সম্পর্কে তথ্যঋদ্ধ বর্ণনা। প্যারীচাঁদ এই ত্রুটির বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। ছাত্রদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে শিক্ষকের কি করা কর্তব্য সে সম্পর্কেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন: "শিক্ষকের কর্তব্য যে, শিষ্যকে কতকগুলি বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখি না করেন। --- শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক, তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবেক যে, পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে—সেরূপ বুঝান শিক্ষার সুধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে—"[১১৭]

---

১১৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

১১৪ ঐ, পৃ. ৪৩

১১৫ ঐ, পৃ. ৭০

১১৬ ঐ, পৃ. ৭১

১১৭ ঐ, পৃ. ৬৮-৭৯

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা গেল প্যারীচাঁদ শিক্ষার ত্রুটি বিশ্লেষণ করে তার সংস্কার সাধনেও প্রয়াস পেয়েছেন।

তৎকালীন সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন ছিল এবং তার ভয়াবহ পরিণতিও সমাজের সচেতন মানসকে ভাবিয়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা সে কথা লক্ষ্য করেছি। বলা বাহুল্য যে, প্যারীচাঁদ এর সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিলেন না। কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহ অভিশাপ 'আলালে'র কাহিনীর ৬ এবং ১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বাবুরামবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদা সেই অভিশাপের শিকার। প্রমদার যে ছেলেবেলায় এক কুলীনের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে কথা সে বড় হয়ে পিতা-মাতার মুখে শুনেছে। কিন্তু পতির মুখ দেখেনি কোনদিন। তবে হ্যাঁ, বিয়ের ষোলো বছর পরে একদিন দেখেছিল, সেদিনের কথা প্রমদার মুখ থেকেই শোনা যাক :

"আর বৎসর যখন আমি পালা জ্বরে ভুগতেছিনু—দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম—উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন···তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়া অমনি বল্লেন—ষোলো বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি—তুমি আমার এক স্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকট আসিতেছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বললাম। তিনি তো ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বললাম মাকে জিজ্ঞাসা করি—মা যা বলবেন তাই করবো। এই কথা শুনিবামাত্র আমার হাতের বালাগাছটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেম—আমি তাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু,···"[১১৮]

কৌলীন্য প্রথার দ্বিতীয় অভিশাপ-আলেখ্য ধরা পড়েছে 'আলালে'র কাহিনীর ১৮ অধ্যায়ে। কোন অজ্ঞাতনামা অসহায়া নারীর উক্তিতে। প্রসঙ্গটা এসেছিল এই-ভাবে : অশীতিপর বাবুরামবাবু কোনো এক কনের বাপের কুলরক্ষার জন্য বিয়ে করতে চলেছেন। তাকে দেখে জলের ঘাটের স্ত্রীলোকেরা বিভিন্ন মন্তব্য করেন। মন্তব্য প্রসঙ্গে এক কুলীন কন্যা বলেন : "আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় আমার বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না—শুনেছি তার পঞ্চাশ ষাটটি বিয়ে, বয়স আশি বছরের উপর—থুরথুরে বুড়া,---। বড়ো অধর্ম না হলে আর মেয়েমানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না।"[১১৯]

আর এক কুলীন কন্যার উক্তি : "···ওগো জল তোলা হয়ে থাকে তো চল—ঘাটে এসে আর বাক্‌চাতুরীতে কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার সঙ্গে বে হয় তার তখন অন্তর্জলী হচ্ছিল। কুলীন বামুনদের কি ধর্ম আছে না কর্ম আছে—"[১২০] গ্রামের বুড় মজুমদার—যিনি বাবুরামবাবুর বিয়েতে গিয়েছিলেন—কুলীন নারীদ্বয়ের এই কথোপকথন শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। "মেয়েগুলার কথোপকথন শুনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও যাওন কালীন বেণীবাবুর কথা স্মরণ হইতে লাগিল।"[১২১] বলা বাহুল্য যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের মনের কথাই মজুমদারের উক্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

---

১১৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০-৮১

১১৯ ঐ, পৃ. ১৩৩

১২০ ঐ, পৃ. ১৩৩

১২১ ঐ, পৃ. ১৩৩ * মতিলালের 'যশোরের তালুকে'র কর্মচারী।

তৎকালীন সমাজে নীলবিদ্রোহের আন্দোলন ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ২৫ অধ্যায়েও নীলবিদ্রোহের (১৮৫৮-৬০) একটি চিত্র আছে। এর মধ্যে দিয়ে প্যারীচাঁদের সমাজ সচেতনতার পরিচয় আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীলকরের দৌরাত্ম্যে সমস্ত চাষী প্রজারা অতিষ্ঠ। উৎকৃষ্ট ধানের জমিতে জোর করে নীল করানো হচ্ছে। এমনকি বুনানো ধানের জমিতে লাঙ্গল দিতেও তারা কসুর করেনি। এমনি পরিস্থিতিতে প্রজা চাষীকুল ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে। প্যারীচাঁদ সে চিত্রের বর্ণনায় বলেন: "নায়েব নিকটে যাইয়া মেঁও মেঁও করিয়া দুই একটা কথা বলিল, কুঠেল হাঁকায় দেও মার হাঁকায় দেও মার হুকুম দিল। এমনি দুই পক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল—কুঠেল আপনি তেড়ে এসে গুলী ছুঁড়িবার উপক্রম করিল—নায়েব সরে গিয়া একটা রাংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। ক্ষণেককাল মারামারি লাঠালাঠি হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েকজন ঘায়েল হইল।---প্রজারা বাটীতে আসিয়া "কি সর্বনাশ" "কি সর্বনাশ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।"[১২২]

এইভাবে 'আলালের ঘরের দুলালে'র আদ্যন্ত কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সমাজসচেতনতা ও সমাজসংস্কারের স্পষ্ট পরিচয় তাতে বিধৃত আছে। বস্তুতঃই প্যারীচাঁদ একজন সমাজসংস্কারক শিল্পী। রামলাল চরিত্র সৃজনের মধ্য দিয়ে তাঁর সংস্কারক মনের পরিচয় আরও স্পষ্ট। পিতামাতার অধিক প্রশ্রয়ে ও অসৎ-সঙ্গীদের সাহচর্যে মতিলালের কুশিক্ষা অর্জন এবং আদর্শ শিক্ষকের (বরদাবাবু) সাহচর্যে রামলালের সুশিক্ষা অর্জন; কাহিনীতে এই দুই বিপরীত দিকের অবতারণা করে লেখক পরিশেষে এই কথাই বলতে চান যে, 'মতিলালের মতো আদর্শ চরিত্রই সমাজের কাম্য'। আর তার জন্য অন্যতম শর্ত—বাল্যকাল থেকে ছেলেদের কড়া শাসনে রাখা এবং বরদাবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষা গ্রহণ করা।

২. মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯ খ্রী.)

প্যারীচাঁদের সমাজসংস্কারমূলক দ্বিতীয় নক্সা 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'। এরও কয়েক অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৩] ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১২৪]

সমকালীন জীবনচিত্রের যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য নক্সাজাতীয় গ্রন্থটিতে। সেকালে ইংরেজদের অনুকরণে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। মদ্যপানের কুফল প্যারীচাঁদের দৃষ্টিতে তীব্রভাবে ধরা পড়েছিল।

এই গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই এর উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়ে। বিভিন্ন চরিত্রের উদাহরণের মাধ্যমে তিনি মদ্যপানের শোচনীয় পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং মাঝে মাঝে উপদেশচ্ছলে এর থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। মোট কথা, 'মদ্যনিবারণী সভা'র যা' উদ্দেশ্য 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থের একই উদ্দেশ্য।

---

১২২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

১২৩ ঐ, পৃ. ১৯৯

১২৪ ঐ, পৃ. ২৭

এ গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে 'মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে—মাতাল নানারূপী', 'মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে'; 'নেশাতেই সর্বনাশ' ইত্যাদি 'মদ খাওয়া বড় দায়' পর্যায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে কোলকাতায় মদ্যপানের ক্রমবিস্তৃতি স্পষ্টভাবে বিধৃত। কিন্তু গোপনে যাঁরা মদ্যপান করে তাঁরাই আবার প্রকাশ্য মদ্যপায়ীদের জাতিচ্যুত করার মন্ত্রণায় লিপ্ত। তাঁদের মুখেই শোনা যায়, "গেল গেল হিন্দুয়ানী"। এ অংশই দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ 'জাত থাকার কি উপায়' পর্যায়ের।

প্যারীচাঁদের সমাজসচেতনতা কত প্রখর ছিল তার পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথম খণ্ডে 'মদ্যপানের ক্রমবিস্তৃতি' সম্পর্কে যা বলেছেন তার উল্লেখই বোধ করি যথেষ্ট: "কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী কি বড় মানুষ, কি যুবা কি বৃদ্ধা সকলেই মদ্য পাইলে অন্নত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছুদিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়?" গাঁজা খোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল "আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামের শালিগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেঁপিপিসী—যাঁহার বয়স ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন।" কলিকাতা এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ।"[১২৫]

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় 'আলালের' কাহিনীর সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। হিন্দুকলেজের তখনো পত্তন হয়নি। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীর সূচনা হিন্দুকলেজ-উত্তর সময়ে। মদ্যপানের ছড়াছড়ি তখন কোলকাতার সমস্ত অলিতে গলিতে। প্যারীচাঁদের উপর্যুক্ত বিবৃতিতে সচেতনতার সেই পরিচয় প্রকট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মদ্যপানের শোচনীয় পরিণতি ব্যক্ত হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের কাহিনী হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র ভবানীবাবুর চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ভবানী বাবু মদের নেশায় ঘোর মাতোয়ারা, মদই তার নিত্যসঙ্গী। মদ না হলে তিনি ক্ষণিক-কালও বাঁচবেন না—এই তাঁর ধারণা। এই জাতীয় মদ্যপায়ীর পরিণতি যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই তার এক কঠিন ব্যাধি দেখা গেল। অর্থাৎ হাত-পা অবশ হয়ে গেল। স্ত্রীপুত্র পরিজন ও ডাক্তার হেয়ারের সেবা শুশ্রূষায় সে এই প্রথম পক্ষাঘাত থেকে মুক্তি পেল বটে কিন্তু মদকে সে চিরতরে ছাড়তে পারল না। যদিও ডাক্তার হেয়ারের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সে স্বীকার করেছিল কোন-দিন আর মদ স্পর্শ করবে না। যাই হোক, অধিক মদ পানের পরিণতি স্বরূপ দ্বিতীয় পক্ষাঘাতে এবারে তার হাত পা একেবারেই বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। ডাক্তারের চেষ্টায়ও এবার আর সে রক্ষা পেল না। কঠিন কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে অতি অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হোল অবশ্য মৃত্যুর পূর্বকালে তাঁর মনে গভীর অনুশোচনা দেখা দিয়েছিল। প্যারীচাঁদ ভবানীবাবুর কঠিন পীড়া ও পরিশেষে মৃত্যু কাহিনীতে অবতারণা করে মদ্যপায়ীদের মদ পান থেকে বিরত থাকার পরোক্ষ তাগিদ জ্ঞাপন করেছেন। এখানে তার সংস্কার প্রয়াসের স্বাক্ষর বিধৃত।

জয়হরি বাবু ও 'পক্ষিরাজদলে'র নেতা লাউসেনের পৌত্র আগড়ভম সেন ও অন্যান্য পক্ষিদের অধিক নেশার ফলেই শোচনীয় পরিণতি ঘটে। 'নেশাতেই সর্বনাশ' নামক

---

১২৫ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

পরিচ্ছেদে (৩য়) সে শোচনীয় পরিণতির কাহিনী বিধৃত। পক্ষীরা সকলে সন্ধ্যার দিকে আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। মাত্রাতিরিক্ত মদ পান করে তারা বিভিন্ন রকমের মাতলামী শুরু করে দিত। লেখক সে মাতলামী দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর সমাজসচেতনতার পরিচয়ই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। যেমন :

"সন্ধ্যার সময় পক্ষীসকল বোধ করিত ;···সপ্তলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—সশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক এক জন পড়িতে পড়িতে উঠিয়া বলিত, "আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই।" আর একজন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—"না বাবা, কর কি, একটু থাম এই ঝুলিয়া বাদে যেও। পক্ষীদিগের গান সকল অতি বিচিত্র। সকলে মিলে সর্বদা এই গান গাইত—"বড় বিলের পাখী মোরা ছোটবিলের কে, আবার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে—কুকু রাম শালিকে ; কু কুকু গঙ্গাফড়িং।"[১২৬]

'পক্ষীরাজ' আগড়ভম ও তার সাথী পক্ষীরা এইভাবে ঘোর নেশাতে মত্ত হওয়ার দরুণ একদিন হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়ে। এর পরবর্তী পর্যায়ে তাদের পাপের শাস্তি লেখক এইভাবে বর্ণনা করেছেন : ---"তাহার (আগড়ভম) ও দলস্থ সকলের অতিশয় অনটন হওয়াতে গাঁতের মাল কিনিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ দশ দিন করিতে করিতে একদিন ধৃত হইয়া বিচারান্তে সকলের সাজা হুকুম হইল।"[১২৭]

মদ্যপায়ীদের শাস্তির স্বরূপ নির্ণয় করেই প্যারীচাঁদ ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি উপদেশছলে 'জয়হরি'কে যে সকল কথা বলেছেন তাতে তাঁর সংস্কারক মনের পরিচয়ই আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অবশ্য তিনি অজ্ঞাতনামা এক 'প্রাচীন ব্যক্তির' রূপকে উপদেশ দিয়েছেন। সে উপদেশ হল এই :---"বাবা! এক্ষণে উপায় নাই, লোকে সঙ্গ অথবা কর্মদোষেই মজে যায়, এটি সদাসর্বদা স্মরণ না থাকিলে ভারি বিপদ ঘটে—এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি খালাস হইয়া সাধুসঙ্গ করিও এবং মনে রাখিও যে, কুসঙ্গ ও নেশাতেই সর্বনাশ।"[১২৮]

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে প্যারীচাঁদের সমাজসচেতন দৃষ্টি স্পষ্টত লক্ষ্য করেছে সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভণ্ডদের আচরণ যাঁরা গোপনে মদের সেবায় নিয়োজিত অথচ তাঁরাই আবার প্রকাশ্য মদ্যপায়ীদের জাতি মারার জন্য উদ্যত। এই ভণ্ডদের মধ্যে গুরুদেব হোল ভবশঙ্কর বাবু ও প্রেমচাঁদ দত্ত। দিগম্বর বাচস্পতি ও হলধর গোস্বামী তাদের সহযোগী। হরিনাথ দত্ত ইংরেজদের মতো প্রকাশ্যে মদ পান করে বলেই তাঁর বোনের বিয়েতে যাঁরা গিয়েছিল তাঁদের জাতিচ্যুত করতে এইসমস্ত গোপন মদ্যপায়ীরা উঠেপড়ে লেগেছে। 'জাতি রক্ষার্থ সভা'য় ভবশঙ্কর বাবুর উক্তি :—"আমি আপনাদিগের দলপতি,---হরিনাথ দত্তকে বহিষ্কৃত করা কর্তব্য এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যে যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ঠেলা উচিত।"[১২৯]

বলাবাহুল্য, এইজাতীয় কপটদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ হেনেছেন সমাজ-সংস্কারক প্যারীচাঁদ মিত্র। হেমচন্দ্রের উক্তির মধ্য দিয়েই সে ব্যক্রোক্তি প্রকাশিত :

---

১২৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্যারীচাঁদ মানস', "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ২১৬

১২৭ ঐ, পৃ. ২২৬

১২৮ ঐ, পৃ. ২২৬

১২৯ ঐ, পৃ. ২৩২

"ভদ্রলোকে অভদ্র কর্ম্ম করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবে—দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীর আহার ও মদ্যপানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম্ম নাই,----এ রোগের ঔষধ কি?"১৩০

ভবশঙ্কর বাবুর চাকর বলরামের উক্তিতেও তীব্র ব্যঙ্গ। যেমন, "শালারা মদও খাবে আবার সভাও করবে ও জাত মারবে।"১৩১ এই সমস্ত ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারক প্যারীচাঁদ মিত্রের বিক্ষুব্ধ মনের কথাই ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের একটি চিত্রে প্যারীচাঁদ তৎকালীন হিন্দুসমাজে জাতি, ধর্ম ও ধর্মের ধারকদের সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াস পেয়েছেন। স্বপ্ন বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে। কুচবিহারের এক ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখল: 'বৃদ্ধরূপী জ্ঞান' প্রথমে তাকে স্বর্গ দেখানোর পরে নিয়ে এলেন 'আজব শহর কলিকাতায়'। দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ কোলকাতা শহরের অধর্ম ও অনাচার দেখে তো একেবারে হতবাক! এমনি সময়ে ব্রাহ্মণ দেখতে পেল যে একটা বিকলাঙ্গ পলায়ন উদ্যত গরু 'পালাই পালাই' ডাক ছাড়ছে। কিন্তু এক তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ 'তার লেজ ধরে টানছে' আর পার্শ্বেই বোরুদ্যমানা এক স্বর্গকন্যা। ব্রাহ্মণ এই অভূতপূর্ব দৃশ্যের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে 'জ্ঞান' জানালেন, এই গরু হ'ল 'জাতি' লোকটি 'হিন্দুগিরি' আর স্বর্গকন্যা 'ধর্ম'।

ব্রাহ্মণের স্বপ্ন এখানেই কিন্তু শেষ হয়নি। ব্রাহ্মণ আরও দেখল: "জাতি এমন দৌড়িতেছে যে হাজার টানাটানিতেও থামে না হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে টানাটানি হেঁছড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাশ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল ও হিন্দুগিরি চিৎপাত···করে পড়িলেন।"১৩২

এ নিছক স্বপ্নবৃত্তান্তই নয়। তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে প্যারীচাঁদের সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার নির্যাস। হিন্দুধর্ম সত্যিসত্যিই কোন চরম অধঃপাতে নিপতিত তারই যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে স্বপ্নের রূপকে।

এ গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে প্যারীচাঁদের সমাজসচেতনতার পরিচয় আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ভজহরি ও রামানন্দ লোক দেখানোর জন্যই তপজপ করে—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের আচরণ একেবারেই ন্যাক্করজনক। একদিন কোন এক ডোম বিধবা কন্যার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করলে তারা ধরা পড়ে যায় এবং চরম শাস্তি ভোগ করে। এমনকি জাল দলিল করার অপরাধে তাদের জেলে যেতে হয়েছিল। প্যারীচাঁদ এই জাতীয় ভণ্ড ধর্মবাদীদের একটি কৌতুককর নামকরণ করেছেন—'বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে শ্যাম অবতার'।১৩৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, 'এ গ্রন্থের জাতি মারিবার মন্ত্রণা' 'জাতি রক্ষার্থ সভা' ও 'জাতি মারিবার বাসি মন্ত্রণা' এবং 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার' ইত্যাদি

---

১৩০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্যারীচাঁদ মানস', "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ২৩৬

১৩১ ঐ, পৃ. ২৩৭

১৩২ ঐ, পৃ. ২৪৩

১৩৩ ঐ, পৃ. ২৪৫

পরিচ্ছেদগুলির চিত্রসমূহ মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শলিকের, ঘাড়ে রোঁ" প্রহসন দু'টিতে প্রতিফলিত।"[১৩৪]

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ সম্পর্কে এক সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে প্যারীচাঁদের 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থে। এর নামকরণের মধ্যদিয়েও সমাজসচেতনতার স্বরূপ উদ্ভাসিত।

(খ) স্ত্রীশিক্ষামূলক রচনা :

১. রামারঞ্জিকা (১৮৬০ খ্রী.)

'রামারঞ্জিকা' মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে।[১৩৫] প্রত্যেক সংখ্যায় এক এক অধ্যায় করে প্রকাশ পেত এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে।[১৩৬]

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'য় পঠিত 'On Native Female Education' নামক প্রবন্ধেই আমরা নারী শিক্ষার প্রতি প্যারীচাঁদের উৎসাহ লক্ষ্য করি। তারপরে 'মাসিক পত্রিকা'র মধ্যদিয়েও সে প্রয়াস অব্যাহত থাকে। এদেশের অশিক্ষিত মহিলাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'রামারঞ্জিকা'রও সেই একই উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থে স্বামী হরিহর ও স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

'রামারঞ্জিকা' মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রথম ষোলটিতে হরিহর ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর 'গৃহকথা' পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যথাক্রমে 'জাপান দেশের স্ত্রীলোক'; 'সৎস্ত্রীকে স্বামী কখনো ভুলিতে পারে না'; ধর্ম ও অধর্মের পথ; 'ধর্মপরায়ণা নারী' ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। উপর্যুক্ত পরিচ্ছেদগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সত্যি সত্যিই প্যারীচাঁদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস ছিল কতই অভিনব।

প্রথমেই হরিহর ও পদ্মাবতীর 'গৃহকথা' পর্যায়ের আলোচনা করা যাক। স্ত্রী পদ্মাবতীকে সুশিক্ষিতা, সুগৃহিণী ও সুমাতা করবার জন্য স্বামী হরিহর বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিয়েছেন। কখনো বা পৃথিবীবিখ্যাত বিভিন্ন নারী চরিত্রের আখ্যান বর্ণনা করেছেন। স্ত্রীলোকের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতির জন্য—সংসারের সুখশান্তি অব্যাহত রাখার জন্য তাঁদের 'জ্ঞানকরী' ও 'অর্থকরী' উভয় বিদ্যাই জানা প্রয়োজন। যে বিদ্যায় সুবিবেচনা ও ধর্মে মতি জন্মে প্যারীচাঁদ তাঁকে 'জ্ঞানকরী' বিদ্যা এবং যে বিদ্যায় অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হয় তাকে 'অর্থকরী বিদ্যা' বলেছেন।

---

১৩৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৩৫ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

১৩৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা ও ধর্মে মতি না থাকলে সংসারে যে অশান্তির সৃষ্টি হ'তে পারে তারই বর্ণনায় প্যারীচাঁদ বলেন : "যে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি না হয়, তাহাকে কি তাঁহার স্বামী ভালবাসে ও সন্তানসন্ততি কি মায়ের সহিত সম্মান করে, না তিনি গৃহ ও সাংসারিক কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন? --- সে গৃহ ত্বরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও সেখানে অলক্ষ্মীরও দৃষ্টি পড়ে।"[১৩৭] স্ত্রীলোকের সুবিবেচকসম্পন্না ও ধর্মপরায়ণা হওয়া একান্তই আবশ্যক। উপর্যুক্ত বক্তব্যেই তার আভাস স্পষ্ট।

স্ত্রীলোকের 'অর্থকরীবিদ্যা' আয়ত্ত করাও আবশ্যক। আর অর্থকরী বিদ্যার পর্যায়ে পড়ে বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম যথা, সেলাই করা, রিপু করা, কাপড়ে ঝাড়বুটা তোলা, মোমের ও অন্যান্য দ্রব্যের গড়ন গড়া, খেলনা তৈয়ার করা, নক্সা করা, চিত্র করা ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের এই সমস্ত বিদ্যা জানা থাকলে সংসারের অর্থকষ্ট অনেকটা দূর হ'তে পারে। তাছাড়া এর ফলে স্ত্রীলোকের শরীর ও মন ভাল থাকে এবং মেজাজ উত্তম হয়। পদ্মাবতীকে বুঝাতে গিয়ে এই কথাগুলোকে আরও স্পষ্ট করে হরিহর বলেন : "যে স্ত্রীলোক শিল্প কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কর্কশস্বভাব পরিবর্তন হইয়া শান্ত প্রকৃতি হয়, কারণ, এক একটা কর্ম্মে কিয়ৎকাল মনোনিবেশ করিলে তাঁহার সঙ্গে ধৈর্য অভ্যাস হয়।"[১৩৮]

এই প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর বক্তব্য শোনা যাক : পদ্মাবতী : "আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, তুমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝায়ে দিলে। আমি কাল অবধি বোনা-টোনা শিখিতে আরম্ভ করিব।"[১৩৯] বলাবাহুল্য, প্যারীচাঁদের 'রামারঞ্জিকা'র নারীশিক্ষাবিস্তারের প্রত্যক্ষ সুফল পদ্মাবতীর উল্লিখিত বক্তব্যেই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

স্ত্রী যদি সুশিক্ষিতা হয়, তা'হলে তার পরিপোষণে সন্তানও সুশিক্ষা পায়। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া এ বিষয়ে সন্তান মায়ের নিকট যেমন শিক্ষা পায় এমন আর কারো নিকটে পায় না। মাতাই উত্তম শিক্ষাদাতা। এই কথাগুলো বুঝাতে গিয়ে হরিহর বিভিন্ন দেশীবিদেশী মাতৃচরিত্রের উল্লেখ করেন। যেমন, কৌশল্যা, কুন্তী, মহারানী ভিক্টোরিয়া ইত্যাদি।

কেবলমাত্র সুশিক্ষিতা, সুমাতা হওয়াই নয়—স্ত্রীলোকদিগের পরোপকারিণী হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর প্রশ্নের উত্তরে হরিহর ইউরোপের কতক সেবা-পরায়ণা নারীচরিত্রের উল্লেখ করেন। যেমন, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল,—ক্রিমিয়া যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির সময় এই কোমলহৃদয়া নারী আহত সৈন্যদের সেবা করেন। বিলাতের বিবি ফ্রাই দরিদ্র লোকের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা খোলেন। ইটালির রোজাগোভানা অনাথা বালিকাদের বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেন।

এইভাবে হরিহর ও পদ্মাবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন প্যারীচাঁদ। শেষের চারটি পরিচ্ছেদে যে আলোচনা স্থান পেয়েছে, (যেমন, জাপান দেশের স্ত্রীলোক, সস্ত্রীকে স্বামী কখনো ভুলিতে পারে না,

---

১৩৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'রচনা পরিচয়', "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ২৫৪

১৩৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "প্যারীচাঁদ মিত্র", পৃ. ২৬৩

১৩৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ২৬৪

ধর্ম ও অধর্মের পথ—স্বপ্ন ; ধর্মপরায়ণা নারী) তার মধ্য দিয়েও স্ত্রীশিক্ষার কথাই আলোচিত হয়েছে। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, স্ত্রীশিক্ষার আলোচনায় প্যারীচাঁদ দু'টো বিষয়ের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন ; তা হল : স্ত্রীলোককে সুশিক্ষিতা হ'তে হবে এবং তাকে অবশ্যই ধর্মপরায়ণাও হ'তে হবে।

২. এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা (১৮৭৯ খ্রী.)

'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' প্যারীচাঁদ মিত্রের স্ত্রীশিক্ষামূলক রচনা। স্ত্রীলোকেরা যাতে যথার্থ শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য তিনি পৌরাণিক কাহিনী থেকে বিভিন্ন আদর্শ নারী চরিত্রের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। প্যারীচাঁদ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যা' বলেছেন তাতেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

"আর্যবংশীয় মহিলাগণ! আপনাদিগের জন্য এই গ্রন্থখানি রচিত হইল। ---পূর্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। পূর্বকালে অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর শিক্ষা হইত, এই কারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান ছিল। ---এই সত্যের প্রতি মননিবেশ করিরবার জন্য, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। আমার প্রাণগত প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগের চিত্ত যেন নিরন্তর ঈশ্বরেতে মগ্ন থাকে।[১৪০]

সুদীর্ঘ এই ভূমিকায় প্যারীচাঁদের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য যথার্থ ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 'রামারঞ্জিকা'র আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ধর্মপরায়ণা নারীই প্যারীচাঁদের আদর্শ চরিত্র। আলোচ্য ভূমিকার বক্তব্যেও দেখা যায় যে, 'যে আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্তা' সেই জাতীয় নারী চরিত্রই প্যারীচাঁদের কাছে আদর্শস্বরূপ। নারীকে সেই গূঢ় ধর্মচেতনায় অনুপ্রাণিত করার জন্যই প্যারীচাঁদ পৌরাণিক আদর্শস্থানীয়া বিভিন্ন নায়িকাদের স্বভাবচরিত্র, ত্যাগ ও ধৈর্যের উদাহরণ তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

পূর্বকালে 'ব্রহ্মবাদিনী' ও 'সদ্যোবধূ' এই দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিল। ব্রহ্মবাদিনীরা পতিগ্রহণ করতেন না। ঈশ্বর ও জ্ঞানানুশীলনেই তাঁরা নিয়োজিত থাকতেন, সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করেও উত্তমরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁদের ঈশ্বরপরায়ণতা সম্পর্কে প্যারীচাঁদ বলেন : ...'তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য।'[১৪১] এই জাতীয় কতিপয় সদ্যোবধূর পরিচয় দিতে গিয়ে প্যারীচাঁদ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করেন। এঁরা সকলেই ছিলেন ঈশ্বরপরায়ণ এবং পতিব্রতা।

পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্বশী নাটকে। ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী, পাটীগণিত লেখেন। মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যা ও তাঁর বচনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। চিতোরের রানী মীরাবাঈ ছিলেন বড় কবি।[১৪২]

---

১৪০ "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" গ্রন্থের ভূমিকা

১৪১ ঐ, পৃ. ৪৮৭

১৪২ ঐ, পৃ. ৪৯৬

সেকালের রমণীরা রাষ্ট্রও পরিচালনা করতেন। 'প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীয় নারী দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। - - - মহারাষ্ট্রের অহল্যাবাঈ রাজকার্য করেন।'[১৪৩] সম্পত্তির ব্যাপারেও তাঁদের পূর্ণ অধিকার ছিল। বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পেত। মাতা স্বামীর বিষয়ে তার পুত্রের সহিত সমান অংশ পেত।[১৪৪]

এইভাবে সেকালের স্ত্রীলোকদের ধর্মসাধনা, বিদ্যাশিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা, বিবাহাদি সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা ইত্যাদির বিষয়ের উদাহরণ তুলে ধরে প্যারীচাঁদ বর্তমান যুগের স্ত্রীলোকদের সামনে আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

বলাবাহুল্য, পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরপরায়ণ ও শিক্ষিতা ছিলেন বলেই তাঁদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। প্যারীচাঁদ গ্রন্থশেষে তাই আবার আর্য-মহিলাগণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন পৌরাণিক বর্ণিত সেই সমস্ত আদর্শস্থানীয়া নায়িকা চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করতো। "আর্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণা নারী চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় সম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর...।'[১৪৫]

পুনরুক্তি হলেও আবার স্মরণ করছি, স্ত্রীলোকদিগের ঈশ্বরানুভূতির চেতনা উদ্রিক্ত করার জন্যই পুরাণ বর্ণিত বিভিন্ন নায়িকা-চরিত্রের উদাহরণ তুলে ধরেছেন প্যারীচাঁদ আলোচ্য গ্রন্থে। স্ত্রীশিক্ষার সচেতন প্রয়াস এখানেই আভাসিত।

৩. বামাতোষিণী (১৮৮১ খ্রী.)

'বামাতোষিণী' প্যারীচাঁদ মিত্রের স্ত্রীশিক্ষামূলক শেষ রচনা। সমস্ত রচনার ধারাবাহিক প্রকাশের দিক দিয়েও 'বামাতোষিণী' তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা। এটি প্রকাশিত হয় ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ।[১৪৬] গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যা' বলেন, তা' এইরূপ: "বামাতোষিণী নীতিমূলক গল্প, সন্তান পালনের জন্য পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থজ্ঞানের এবং বালিকাদিগের সৎশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে।'[১৪৭] প্যারীচাঁদ ভূমিকায় যা' বলেছেন তাতেও এই কথারই সমর্থন মিলে—"I have therefore written the present work, which is purely a moral tale, leaving out all particular religious ideas, and showing the value of bringing up children, which cannot be taught unless the girls receive a sound moral education."[১৪৮]

---

১৪৩ "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা", পৃ. ৫০২-০৩

১৪৪ ঐ, পৃ. ৫০৫

১৪৫ ঐ, পৃ. ৫০৭

১৪৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "প্যারীচাঁদ মিত্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

১৪৭ ঐ, পৃ. ১৯৪

১৪৮ "বামাতোষিণী" গ্রন্থের ভূমিকা

প্যারীচাঁদ 'রামারঞ্জিকা'য় হরিহর ও গঙ্গাবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্ত্রী-জাতির বিভিন্ন শিক্ষার কথা বলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও নায়ক গোপালচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী শান্তিদায়িনীর কাহিনী বর্ণনা করে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

গোপালচন্দ্র দেবের আদর্শ গৃহিণী শান্তিদায়িনী। শুধু আদর্শ গৃহিণীই নয়—সে ভক্তি-ভাবিনী ও কুলপাবণের আদর্শ মাতাও বটে। পুত্র ও কন্যাকে শান্তিদায়িনী সব সময়ই আপন তত্ত্বাবধানে রাখতেন এবং সৎ উপদেশ দিতেন। এমনকি বাল্যকাল থেকেই যাতে পুত্রকন্যাদের মনে ঈশ্বরচেতনা দৃঢ়তা লাভ করে তার জন্যও তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। গল্পের প্রারম্ভেই শান্তিদায়িনীর মতো আদর্শ মাতৃচরিত্রের উদাহরণ তুলে ধরে প্যারীচাঁদ সমগ্র মাতৃজাতিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার তাগিদ জ্ঞাপন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

অবশ্য পুত্র কুলপাবন ও কন্যা ভক্তিভাবিনীর আদর্শ চরিত্রবান হওয়ার পিছনে পিতা গোপালের প্রভাবও যে কম নয়, সে কথা প্যারীচাঁদও স্বীকার করেছেন কিন্তু তবুও তিনি একথা ভাল করেই জানেন, "মাতা পিতা অপেক্ষা শিক্ষাদায়িনী।''' মাতা স্বীয় কোমল ও স্নেহযুক্ত হস্তে অঙ্গস্পর্শ ও মুখচুম্বনে বালহৃদয়ে যেরূপ উন্নতিভাব প্রেরণ করিতে পারেন সেরূপ শিক্ষকের দ্বারা হইতে পারে না। জগতের প্রধান শিক্ষক নারী।"[১৪৯]---প্রসঙ্গক্রমে একথাগুলো বলেছেন প্যারীচাঁদ। কিন্তু এর মধ্যদিয়েই স্ত্রীজাতিকে জানিয়েছেন তার মাতৃবুভুক্ষ হৃদয়ের মহান কর্তব্যের কথা। এখানেই তার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সার্থক ফলশ্রুতি।

গোপাল ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য বিলাতে যায়। ব্যারিষ্টারী শিক্ষা তার উদ্দেশ্য হলেও সেখানকার স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী জানবার জন্য তার ছিল অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারে কতিপয় ভদ্র পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে তিনি যা' জানতে পারেন তা' হ'ল এই: "ধনীলোকের ছেলেমেয়েদের বাল্যশিক্ষা গৃহেই সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন রকম ছবি দেওয়ালের চারিদিকে টানানো থাকে--ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন তার মাকে ঐ সমস্ত ছবি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে—তখন মা সস্নেহ ও মুখস্বচুনের দ্বারা সকলের প্রশ্নের সদুত্তর দেন। এইভাবে মায়ের সস্নেহে কোমলমতি শিশুদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়।" বলা বাহুল্য এই সমস্ত বিলাতী শিক্ষাপ্রণালী গোপাল তাঁর স্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন।

এখানেই শেষ নয়। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেও তিনি বিদেশী মহিলাদের পর-হিতৈষণা সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেখানে শান্তিদায়িনী ছাড়া আরো অনেক ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। প্যারীচাঁদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস গোপাল-শান্তি-দায়িনী আখ্যানের মধ্য দিয়ে এইভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আসলেই, প্যারীচাঁদ ছিলেন নারী জাগরণের একজন অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই স্ত্রীসমাজের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। স্ত্রীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়েও তিনি 'আধ্যাত্মিকা', 'অভেদী', ও 'যৎকিঞ্চিৎ-'এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সুতরাং "তাঁকে মিল সাহেবের মতো একজন সহৃদয় "feminist" বলেই গণ্য করতে হবে।"[১৫০]

---

১৪৯ "বামাতোষিনী" গ্রন্থের ভূমিকা পৃ. ৫৯৭

১৫০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", ভূমিকা, পৃ. ২৯

(গ) আধ্যাত্মিক রচনা

১. যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫ খ্রী.)

প্যারীচাঁদ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর (১৮৬০ খ্রী.) থেকে অধ্যাত্ম বিষয়ে অনুরাগী হয়ে পড়েন। "*On the Soul*" গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এ বিষয়ে বলেছেন,—"In 1860, I lost my wife, which convulsed me much I took to the study of spiritualism which, I confess I would not have thought to otherwise nor relished its charms"[১৫১]

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনাই স্থান পেয়েছে। এখানে সমাজসংস্কার প্রয়াস তত নেই। কিন্তু তবুও বলতে হয়, প্যারীচাঁদের এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিষ্ট হবে তখন সে হবে আদর্শ মানুষ। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ সেই আদর্শ মানুষেরই প্রতীক। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে অনেক নাস্তিক লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হোল, কুপথগামী লোক সুপথে এল। রামানন্দ নাস্তিকের কথাই ধরা যাক। সে একসময় ঈশ্বরকে অস্বীকার করত এবং নানা পাপকর্মে লিপ্ত থাকত। জ্ঞানানন্দের ও প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে এসে সে তার পূর্বের ভুল বুঝতে পারল এবং সৎপথে ফিরে এল।

এইভাবে 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ আধ্যাত্মিক সাধনার তত্ত্বকথা প্রচারের মধ্য দিয়েও প্যারীচাঁদ মিত্র মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন।

২. অভেদী (১৮৭১ খ্রী.)

'অভেদী'ও প্যারীচাঁদ মিত্রের আধ্যাত্মিক রূপক উপন্যাস। সাত বছর পরে প্রকাশিত 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকায় লেখক নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন: "In 1871, I wrote the "*Avedi*", a spiritual novel in Bengali, in which the hero and heroini have been described as earnest seekers after the knowledge of the soul, and law by the education of pain they obtained spiritual light."[১৫২]

নায়ক অন্বেষণচন্দ্র ও নায়িকা পতিভাবিনীর অধ্যাত্মজীবন বর্ণনাই প্যারীচাঁদের অভিপ্রেত। গৃহদাহের ফলে নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক মিলন ও পরিশেষে বম্বা নামক পর্বতে অভেদীর কাছে অধ্যাত্মসাধনার চূড়ান্ত দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের সমাপ্তি।

এই মূল ঘটনার পাশাপাশি জেকোবাবু, লালবুঝকর এবং বাবু সাহেবের চরিত্রের অবতারণা করে প্যারীচাঁদ অনেকটা বাস্তবের মধ্যে চলে এসেছেন। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন: "এ আখ্যায়িকার লালবুঝকড় চরিত্রের রূপ, বাচনভঙ্গি, পরিণতি, ইত্যাদি ঠকচাচাকে স্মরণ করিয়ে দেয়: অতখানি জীবন্ত না হলেও ঠকচাচার ছায়া এ চরিত্রে

---

১৫১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্যারীচাঁদ মানস', "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", পৃ. ১৬ উদ্ধৃত

১৫২ 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকা, দ্র: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী"

লক্ষ্য করা যায়।''[১৫৩] কিন্তু তবুও বলতে হয় যে, 'অভেদী'তে অধ্যাত্মসাধনায় সমুন্নতিই প্রদর্শিত হয়েছে। প্যারীচাঁদ নিজেও এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন যে আধ্যাত্মিক জীবনই সর্বোৎকৃষ্ট জীবন, নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ প্রেম। তাই তো দেখি অনেকদিন পরে পতিভাবিনীর সঙ্গে অন্বেষণচন্দ্রের যখন মিলন হোল তখন পতিভাবিনীর চিত্তে পার্থিব ভাবের উদয় দেখে অন্বেষণচন্দ্র তাকে 'আত্মা-উচচ-করা'র নির্দেশ দেন।

প্যারীচাঁদ, নায়কনায়িকার এই পার্থিব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণের মধ্য দিয়ে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম দিকের রচনার মতো এই জাতীয় আধ্যাত্মিক রচনায় সমাজসংস্কারের সচেতন প্রয়াস আভাসিত হয়নি—আর তা হওয়া হয়ত সম্ভবত ছিল না। কিন্তু তবুও বলতে হয়—প্যারীচাঁদ মানুষের আত্মিক উন্নতি কামনা করেছেন। আর বলা বাহুল্য যে, মানুষের যখন আত্মিক উন্নতি ঘটবে, তখন সে হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ।

৩. আধ্যাত্মিকা (১৮৮০ খ্রী.)

'আধ্যাত্মিকা'র নামকরণেই স্পষ্ট যে, এটি একটি আধ্যাত্মিক উপন্যাস। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় শেষ জীবনে রচিত এ উপন্যাসে নায়িকা আধ্যাত্মিকার জীবন কথাই বিশ্লেষণ করেছেন। হরদেব তর্কালঙ্কারের কন্যা আধ্যাত্মিকা বাল্যকাল থেকেই আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষা নেয়। তার একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনার সাফল্য দেখে পিতা-মাতা ও পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই বিস্মিত হন। আধ্যাত্মিকা শুধু ঈশ্বরধ্যানেই নিমগ্ন থাকতেন না—তিনি সময় ও অবকাশ পেলেই আর্তের সেবা করতেন। শোক সন্তপ্ত মহিলাদের সান্ত্বনা দিতেন ও ঈশ্বরের অপার মহিমা ব্যাখ্যা করতেন। এছাড়াও আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের জন্য তিনি পল্লীস্থ স্ত্রীলোকসকলকে একত্রিত করতেন এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের কাছে বসে আত্মার উন্নতি বিষয়ক আলোচনা করতেন।

আধ্যাত্মিকার সত্যি সত্যিই চরম আত্মিক উন্নতি ঘটেছিল। মাতা-পিতার মৃত্যু, জ্ঞাতিদের দ্বারা সম্পত্তি গ্রাস এবং সর্বোপরি চরম আর্থিক সঙ্কট আধ্যাত্মিকাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। সে শান্তচিত্তে সমস্ত বিপদকে সহজভাবে গ্রহণ করে নেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞরা এরকমই হয়। বিবাহ করে ঘর সংসার করতেও তিনি ছিলেন অসম্মত। তাঁর ধারণা : ''যে সকল স্ত্রীলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের পতি প্রয়োজন। কারণ পতি গ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সর্বদা অর্পিত হইলে নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপন। নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন।''

আধ্যাত্মিকা উপনিষদের যুগের ব্রহ্মবাদিনীদের মতো ঘরসংসার বিবাহ না করে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করতে থাকেন। যোগ-সাধনাও তাঁর আয়ত্তে ছিল—তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গরীব দুঃখীদের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করেন এবং একদিন গঙ্গাতীরে স্বেচ্ছামৃত বরণ করেন।

প্যারীচাঁদ আধ্যাত্মিকার উচচস্তরের আধ্যাত্মিক জীবন বর্ণনা করে এক আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। নারীর আত্মিক উন্নতি ঘটলে তা যে সমাজের জন্যও কতই না মঙ্গলকর—আধ্যাত্মিকার জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে লেখক সে কথাই প্রমাণ করেছেন। এখানেই 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাস রচনার সার্থকতা।

---

১৫৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্যারীচাঁদ মানস', ''প্যারীচাঁদ রচনাবলী'', পৃ. ১৯

(ঘ) প্রবন্ধজাতীয় রচনা

১. ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮ খ্রী.)

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মে 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়।[১৫৪] লেখক ইতিপূর্বেও ইংরেজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনী (A Biographical Sketch of David Hare) ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন।[১৫৫] কিন্তু স্ত্রীলোক ও ইংরেজীভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদের জন্য, বাংলা পুস্তক দরকার—সেই প্রয়োজনবশতই বাংলায় লেখেন 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত'।

প্যারীচাঁদের অধিকাংশ রচনাই প্রচারধর্মী। আলোচ্য প্রবন্ধজাতীয় জীবনীগ্রন্থটিও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত নিরলস কর্মী ডেবিড হেয়ারের জীবনবৃত্তান্ত উদাহৃত করে বাঙালীকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার পরোক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছেন প্যারীচাঁদ। 'ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিতের' ভূমিকায়ও তিনি তাই বলেন: "যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাহার গুণকীর্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরসা করি এবই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে মহৎ-ভাবের উদয় হইবে।"[১৫৬]

ডেবিড হেয়ার স্কটল্যাণ্ডের লোক। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি এদেশে আসেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। প্যারীচাঁদ যখন হিন্দুকলেজের ছাত্র তখন তিনি নিজবাড়ীতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়ে ডিরোজিও এবং হেয়ার সাহেব মাঝে মাঝে এসে ছাত্র ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতেন। হেয়ার সাহেব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটি স্কুলও খোলেছিলেন পরবর্তীকালে যা' হেয়ার স্কুল বলে পরিচিত হয়েছিল। তিনি ছাত্রদের কিভাবে তত্ত্বাবধান করতেন তার বর্ণনায় প্যারীচাঁদ বলেন:

"প্রতিদিন দশটার মধ্যে পাল্‌কীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিয়া কলেজে [হিন্দুকলেজ] আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। ... প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। ... বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবারাত্রি আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতেন। সকল বালক মনে করিত যে, আমাকে হেয়ার সাহেব যেমন ভালবাসেন, তেমন আর কাহাকেও বাসে না।"[১৫৭]

সত্যি সত্যি ডেবিড হেয়ার পরোপকারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। বলা বাহুল্য ডেবিড হেয়ারের আদর্শে আমরাও যাতে অনুপ্রাণিত হ'তে পারি সেইজন্যই প্যারীচাঁদ এই জীবনীগ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থশেষে তিনি এই কামনা করেছেন: "জগদীশ্বর

---

১৫৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "প্যারীচাঁদ মিত্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

১৫৫ ঐ, পৃ. ১৯৫

১৫৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী", 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিতে'র ভূমিকা

১৫৭ ঐ, পৃ. ৫১৬-৫১৮

আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।"[১৫৮]

পুনরুক্তি হলেও আবার স্মরণ করছি, প্যারীচাঁদ এই জীবনীগ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে সমাজের মঙ্গল কামনা করেছেন। 'ভূমিকা', ও 'গ্রন্থশেষে'র বক্তব্যেই সে কথা স্পষ্ট। প্যারীচাঁদ এছাড়াও কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ 'কৃষিপাঠ' ও ব্রহ্মবিষয়ক গানের সংকলন 'গীতাঙ্কুর' লেখেন। এতে আপাতদৃষ্টিতে সমাজসচেতনতা বা সংস্কারের কোনো প্রয়াস নেই। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখাবোঝা যায়, দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নততর করে এবং ধর্মচেতনায় একেশ্বরবাদের মহান আদর্শ প্রচার করেও তিনি দেশ ও সমাজের কল্যাণ কামনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এর মাধ্যমেও তাঁর সমাজসচেতনতাই প্রকাশ পেয়েছে। আসলে কর্মী এবং সমাজসংস্কারক প্যারীচাঁদ সাহিত্য রচনার আনন্দে সাহিত্য সৃষ্টি করেননি; তাঁর তাবৎ সাহিত্য-প্রয়াসের পেছনে সমাজ সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। ফলে, তাঁর রচিত সকল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ ও মানবকল্যাণচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সমাজসংস্কার কর্মীদের (রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রমুখের সঙ্গে তুলিত হলেও প্যারীচাঁদ মিত্রের সংস্কার ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ছাত্রাবস্থায় স্বগৃহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং কর্মীজীবনে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনে যোগদান করে তিনি সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করেছেন।

তিনি একদিকে যেমন বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন, অন্যদিকে আবার বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেও সমাজচেতনাকে উদ্রিক্ত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, প্যারীচাঁদ মদ্যপান নিবারণ, নারীশিক্ষা বিস্তারে, পাঠাগার সংগঠনে, সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনে এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি তৎকালীন প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

প্যারীচাঁদ ছিলেন যথার্থতই একজন প্রগতিশীল সমাজসংস্কারক। হিন্দুকলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সমাজের মঙ্গল সাধনে নিবিষ্ট ছিলেন। গ্রন্থ রচনার প্রেরণাও এই সচেতনাসম্ভূত। তাঁর তাবৎ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নারীজাগরণের অত্যুজ্জ্বল দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো বা পরোক্ষে। প্যারীচাঁদের স্ত্রীশিক্ষামূলক রচনা, আধ্যাত্মিক রচনা এবং আংশিক হলেও নক্সাজাতীয় রচনায় সে দিকগুলি ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য, তাঁর এই প্রয়াসের সূত্র ধরেই পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজে নারীর স্বতন্ত্র অধিকার সূচিত হয়েছিল।

শুধু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়—মদ্যপান নিবারণে, পাঠাগার সংগঠন ও উন্নত কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকাও শ্লাঘার সঙ্গেই স্মরণীয়। সত্যি সত্যিই প্যারীচাঁদ মিত্রের কর্মবহুল সংস্কারক জীবনের এবং তাঁরই প্রেরণাসম্ভূত সংস্কারকমূলক রচনার পর্যালোচনা শেষে একথাই মনে হয়—তিনি ছিলেন যথার্থতই একজন প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারক।

---

১৫৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, "প্যারীচাঁদ রচনাবলী," 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিতে'র ভূমিকা, ঐ, পৃ. ৫২৪